সম্পাদকীয়

বিজয়ের মাসের ভাবনা

আরও একটি ঘটনাবহুল বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছি আমরা। পেরিয়ে যাচ্ছে আরও একটি বিজয়ের মাস। ১৯৭১ সালের এই মাসেই আমাদের পূর্বপুরুষরা পশ্চিম পাকিস্তানের দানবীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে মুক্ত করেন। অতিক্রান্ত হয় ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী একটি মাইলফলক। সেই থেকে গত ৪৬টি বছর পেরিয়ে গেছে, বদলে গেছে অনেক কিছুই। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি ও দেশের অভ্যন্তরের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'দিক থেকেই।

ইতিবাচক পরিবর্তন এই যে, ছিচল্লিশ বছরের পথচলায় অনেকাংশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, অবকাঠামো, শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। সময়ের ধারাবাহিকতা ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় মানুষের বস্তুগত উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু নেতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট প্রত্যেকটি মুসলিমপ্রধান দেশে যে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে, আমরা ক্রমশই তার ভুক্তভোগী হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছি। একদিকে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দেওয়া ও তার সূত্র ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র মিয়ানমারের বৈরিতা বাংলাদেশকে নতুন এক বাস্তবতার মুখোমুখী করেছে। উদ্ভূত এই বাস্তবতা আমাদেরকে চোখে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে একাত্তরের মতই সতেরোতেও ধর্ম-বর্ণ-মতাদর্শ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে। ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারলে সমস্ত অর্জনই যে ম্লান হয়ে যাবে তার প্রমাণ পেতে শুরু করেছি আমরা। অথচ ঐক্যবদ্ধ হবার কোনো প্রচেষ্টাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

এরই মধ্যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে অস্থিরতা দানা বাঁধছে। বিগত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া অচলাবস্থা ও পেট্রলবোমার তাণ্ডবের ক্ষত এখনও শুকোয় নি। আগামী নির্বাচন ঘিরেও তেমন অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে কিনা এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা উড়িয়ে দিতে পারছেন না কেউই। আমরা যদি মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকাই তাহলে ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনের ধ্বংসস্তুপ থেকে শিক্ষা পাই। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলো মুসলিমপ্রধান দেশগুলোকে কীভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় তার বাস্তব নমুনা পাই। একটি মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উচিত হবে না স্বার্থান্বেষী মহলগুলোর হাতে তেমন কোনো সুযোগ তুলে দেওয়া। কিন্তু এই চেতনাবোধ কি আমাদের মধ্যে জাগ্রত আছে? স্পষ্টত নেই।

আজকের এই ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আমাদের অর্জনগুলোকে যেমন মূল্যায়ন করতে হবে, তেমনি আমাদের ব্যর্থতাগুলোকেও বিবেচনায় নিতে হবে। একাত্তরের সংকট আর আজকের সংকট এক নয়। তখন যে বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতিকে পরিচালিত করেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, আজকের বাস্তবতা, আজকের প্রেক্ষাপট তা থেকে একেবারেই আলাদা। জাতির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আজকের সংকট, আজকের পরিস্থিতি-প্রেক্ষাপটকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে, সেই আলোকে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

সূচিপত্র

- *একাত্তরের সঙ্কট বনাম আজকের সঙ্কট*..... ২
- *বিজয় দিবসের শিক্ষা*..... ৪
- *অপপ্রচারের আড়ালে চাপা পড়ে যায় সত্য* ৬
- *কমিউনালিজম - আসাবিয়াত - সাম্প্রদায়িকতা*..... ৯
- *রেনেসাঁর স্বপ্ন এখন সত্য হওয়ার পথে* ১৪
- *মৌসুমী বাতাসের মতো জনতার 'মন' দিক পাল্টায়!*.....১৭
- *সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা: শুধু শক্তি প্রয়োগ করে সম্ভব নয়*..... ১৮
- *দিশাহারা মুসলিম জাতির এখন কী করণীয়?* ২১
- *ইসলাম নিয়েই বাঁচতে হবে* ২৫
- *ইসলাম কীভাবে মানুষের হৃদয় জয় করেছিল?*..... ২৮
- *'দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি' প্রসঙ্গে আল্লাহ ও রসুলের বাণী* ৩০
- *জঙ্গিবাদ ইসলামে নাই তো বুঝলাম, কিন্তু আছেটা কী?*..... ৩২

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ **ওয়েব:** www.bajroshakti.com **ই-মেইল:** bajroshakti@gmail.com

একাত্তরের সঙ্কট বনাম আজকের সঙ্কট

মোহাম্মদ আসাদ আলী

১৯৭১ সালে এ দেশ থেকে অগণিত মানুষ প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিতে ছুটে গিয়েছিল। ২০১৭ সালে আমরা দেখলাম মিয়ানমার থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে এলো। তখনকার সংকটটা ছিল স্বাধীনতা অর্জনের, আর আজকের সংকট স্বাধীনতা রক্ষার। রোহিঙ্গাদের সাথে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অমানবিক আচরণ, সীমান্তে যুদ্ধপরিস্থিতি সৃষ্টির উস্কানি, জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতাসহ নানা কারণে দেশের সার্বভৌমত্বই এখন হুমকির মুখে।

ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস, গৌরবের মাস। প্রতি বছর এই মাসটি স্মরণ করিয়ে দেয় দেশের জন্য মানুষের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা কী অকল্পনীয় ত্যাগ স্বীকার করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। তাঁদের সেই আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক পরিচয় দিতে পারছি। তাঁরা যদি সেদিন সমস্ত মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারতেন তাহলে আমাদের ইতিহাস হয়তো গৌরবের হতো না, শোচনীয় হতো। এই যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, এটা কিন্তু মোটেও সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তা সম্ভব হয়েছিল কেবল এ কারণে যে, তাঁরা তাঁদের জাতীয় সঙ্কটকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যদি মূল সঙ্কট তাঁরা উপলব্ধি করতে না পারতেন, এ ব্যাপারে তাঁদের মনে ধোঁয়াশাভাব থাকত, তাহলে স্বাধীনতার প্রশ্নে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন না। বস্তুত সমকালীন সঙ্কটকে উপলব্ধি করতে পারাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।

স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের মূল সঙ্কট কী ছিল? শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ইত্যাদি। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করত। এতবড় একটি জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে সুযোগ-সুবিধা তারা নিজেদের করে নিতো। আমাদের কর্মক্ষম বিশাল জনশক্তি ছিল, আমাদের যথেষ্ট উৎপাদন ছিল, কিন্তু দিনশেষে দেখা যেত পূর্ব পাকিস্তানের জীবনমানের কোনো উন্নয়ন নেই। একই দেশের মধ্যে আমাদেরকে বসবাস করতে হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হতে লাগল। চিন্তাশীল মানুষ লেখার মাধ্যমে, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বক্তৃতার মাধ্যমে জাতিকে সচেতন করতে লাগলেন। বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার বুঝে নিতে প্রেরণা যোগালেন। এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধুর মত অবিসংবাদিত নেতৃত্ব জাতির মনে আকাশচুম্বী সাহসের সঞ্চার করল। বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণে বাঙালি বুঝে গেল এখন তাদের শত্রু কে, মুক্তি কোথায় ও করণীয় কী। রক্তসাগর পাড়ি দিয়ে দেশকে স্বাধীন করা হলো। সঙ্কটের অবসান ঘটল।

কিন্তু আজ ২০১৭ সাল। এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে ৪৬টি বছর। এই দীর্ঘ সময়ে পদ্মা, মেঘনায় গড়িয়ে গেছে বহু জল। দারিদ্র্য এখন আর সর্বপ্রধান সঙ্কট নয়। প্রতিনিয়ত গ্রামে-গঞ্জে পাকা দালান উঠছে। ঘরের কাছে ব্যাংক হয়েছে, বুথ হয়েছে। রাস্তা পাকা হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ এসেছে। ঘর ঘরে চলছে টিভি, শোভা পাচ্ছে ফ্রিজ, দামী আসবাবপত্র। হাতে হাতে মোবাইল, ইন্টারনেট। ডিশ এন্টেনার সংযোগ সর্বত্র। সাইকেল বেঁচে কেনা হচ্ছে মোটর সাইকেল। পায়ে ঠেলা ভ্যানের দখল নিচ্ছে ব্যাটারিচালিত অটোরিক্স, সিএনজি। না খেয়ে রাত পার করে এমন মানুষ আজ চোখে পড়া দায়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি না করেও স্ত্রী-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার মতো অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। দেশে কর্মসংস্থান খুঁজে না পেলে মানুষ প্রবাসে চলে যাচ্ছে। প্রায় এক কোটি তরুণ বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে। হাজার খোঁজাখুঁজি করেও ক্ষেতের শ্রমিক পাওয়া যায় না।

বাচ্চারা এখন বাঁশের পাতার নৌকা খেলে না, তারা খেলছে ব্যাটারিচালিত রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, হেলিকপ্টার নিয়ে। অর্থাৎ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমরা কিছুটা হলেও সফল হয়েছি। কিন্তু এরই মধ্যে জন্ম নিয়েছে হাজারো নতুন সঙ্কটের। বলা চলে, ইতিহাসের সবচাইতে অনিরাপদ সময় অতিক্রম করছি আমরা। আমাদের এই নতুন সংকটসমূহ যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে তাকে মোকাবেলার প্রশ্নই উঠে না।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি আমাদের সামাজিক অপরাধ ধাইধাই করে বেড়েছে। বর্তমানে তা রীতিমতো মহামারীর রূপ নিয়েছে। সামান্য স্বার্থের বশবর্তী হয়ে মানুষ পাশবিক আচরণ করতে দ্বিধা করছে না। বাবা সন্তানকে গলাটিপে মারছে। সন্তান বাবার গলায় ছুরি চালাচ্ছে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে খুন, ধর্ষণ, ব্যাভিচার প্রতারণা, জালিয়াতি। অফিস, আদালত, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ তো বটেই, এমনকি নিজ বেডরুমেও মানুষ নিরাপত্তাবোধ করে না। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অজানা আতঙ্ক, অজানা আশঙ্কা মানুষের নিত্যসঙ্গী। ছোট ছোট শিশুদেরকে নির্মমভাবে পিটিয়ে, গলা কেটে, শ্বাসরোধ করে, ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হচ্ছে। নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানী, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি অপরাধ শত আইন করেও ঠেকানো যাচ্ছে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। রক্ষকরা হয়ে উঠছে ভক্ষক। দুর্নীতি, প্রতারণা আর শঠতার মধ্য দিয়ে কে কাকে ঠকিয়ে, কিভাবে রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পদ লুট করে নিজে লাভবান হতে পারে সেই চেষ্টা করছে। সমাজের দুর্নীতিবাজ, খারাপ মানুষগুলো নেতৃত্বের আসনে আসছে। রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক কোন্দল যেন এক চিরাচরিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর আমাদের গত ৪৬ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস জাতির মধ্যে অনৈক্য, রক্তারক্তি, হানাহানি আর ক্ষমতার কামড়াকামড়ির ইতিহাস। গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে এক জাতিবিনাশী খেলা চলছে। রাজনীতি হওয়ার কথা ছিল মানবতার কল্যাণে, কিন্তু তার বদলে রাজনীতির নামে আমরা যেটা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি সেটাকে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর 'নৈতিকতাবর্জিত ক্ষমতার লড়াই' বলা ছাড়া অন্য কোনো নামে অভিহিত করা যায় না। এই অপরাজনীতি একটি দিনের জন্যও জাতিকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি, ঐক্যবদ্ধ থাকতে দেয় নি। আরেকদিকে ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে বিভিন্ন মত-পথ, দল-উপদল, ফেরকা সৃষ্টি করে জাতির ঐক্য নষ্ট করে চলেছে। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে বারবার ভুল খাতে প্রবাহিত করছে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে জাতিকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ ও ঘৃণার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে নতুন বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সন্ত্রাসবাদ'। এই সন্ত্রাসবাদ যেখানেই গিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদও সেখানে গিয়েছে এবং কিছুকালের মধ্যেই সেই দেশকে গণকবর বানিয়ে ছেড়েছে। সিরিয়া, লিবিয়ার শুরুটা কিন্তু এভাবেই হয়েছিল, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসবাদের অনুপ্রবেশ, অতঃপর সাম্রাজ্যবাদীদের রঙ্গমঞ্চ হয়ে ওঠা। কে বাংলাদেশকে সেই পথ থেকে সরাবে? কে এই ধান্দাবাজির রাজনীতিতে যবনিকাপাত টানবে? কে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে মানুষের ঈমানকে ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করবে? কে সকল ধর্মের মানুষকে দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত করে ঐক্যবদ্ধ করবে? কে মানুষকে আত্মাহীন বস্তুবাদী সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করে নৈতিক গুণসম্পন্ন মানবিক মানুষে পরিণত করবে? কে আদর্শচ্যুত এ জাতিকে আবার একটা ন্যায়-নিষ্ঠ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে? আবারও বলছি, ৪৬টি বছর পেরিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটও পাল্টে গেছে অনেকখানি। প্রতি মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সীমান্তে সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে, রাষ্ট্রনায়করা একে অপরের সাথে হুমকির ভাষায় কথা বলছেন। আঞ্চলিক ভূরাজনীতিও আগের জায়গায় নেই। এক সময় মনে হত সবাই বুঝি বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ভিন্ন হিসাব নিকাশ। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র তাদের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত।

এমতাবস্থায়, ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমরা যে ভূখণ্ডটি অর্জন করেছি, সেটার নিরাপত্তা নিয়ে আমরা ভাবছি তো? আমরা যদি যুগের এই সঙ্কটগুলো উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই, এগুলোর সমাধান করতে না পারি, তাহলে কেবল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে কিংবা অবকাঠামো নির্মাণ করে জাতিকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে সুশীল সমাজ, নাগরিক সমাজ, বুদ্ধিজীবী মহলসহ সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেককে উপলব্ধি করতে হবে, ১৯৭১ এর বাস্তবতা আর ২০১৭ এর বাস্তবতা এক নয়। তখনকার সঙ্কট আর আজকের সঙ্কটও এক নয়। আমাদের বর্তমান সঙ্কটকে যদি আমরা উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে একাত্তরের অর্জনকে ধরে রাখায় আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

বিজয় দিবসের শিক্ষা

রাকীব আল হাসান

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। বাঙালি জাতির জন্য এ এক অনন্য গৌরবের মাস। ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা দীর্ঘসময়ের পরাধীনতার গ্লানি ঘুচিয়ে মুক্তির সুধা পান করি। দীর্ঘদিনের শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন আর গোলামির হাত থেকে বাঁচার যে সম্ভাবনা সেদিন সৃষ্টি হয় তা নয় মাস যুদ্ধ করে ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ আর ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্মান বিসর্জনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের এই দিনটিতে।

সুলতানি আমল পর্যন্ত এই বঙ্গভূমি স্বাধীন ছিল। টাঙ্গাইলের করটিয়ার ঐতিহ্যবাহী পন্নী (পূর্বে এই বংশের নাম ছিল কাররানি) পরিবারের উত্তরসূরি সুলতান দাউদ খান কাররানি ছিলেন বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে এই বঙ্গভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি জীবন দেন। সুলতান দাউন খান কাররানির আমলে স্বাধীন সুলতান হিসাবে তার নামেই খুতবা পাঠ করা হতো এবং তার নামেই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক বিচারে এই দাউদ খান পন্নীই বাংলার ইতিহাসে সর্বশেষ স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমান্ডার ও জমিদারগণ দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও পরে অবশ্য তারাও মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে এই বঙ্গভূমি পরিচালনা করেছে মোঘল সম্রাটদের অধীনস্ত ও মোঘল সম্রাট কর্তৃক নিয়োগকৃত সুবেদার ও নবাবগণ (নায়েব)। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নবাবী আমলের কার্যত পতন ঘটে এবং বাংলা চলে যায় ব্রিটিশদের অধীনে। শুরু হয় অবর্ণনীয় শোষণ আর নির্যাতন। তাদের শোষণের ফলেই ছিয়াত্তরের মনন্তরে এ অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়, জীবিত মানুষ মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করে। এভাবে চলে প্রায় দু'শ বছরের অত্যাচার আর শোষণের যুগ। পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চলকে শোষণ করে চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করে ১৯৪৭ সালে তারা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার সময় এ অঞ্চলের মানুষ যেন একদিনের জন্যও ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সেজন্য তারা বেশকিছু শয়তানী চক্রান্ত করে রেখে গেল। তার মধ্যে ভৌগোলিকভাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অধীন করা, ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ অন্যতম। তারা বাংলাদেশকে স্বাধীনতা না দিয়ে পাকিস্তানের অধীন করে রেখে গেল ফলে ব্রিটিশ শাসনের মতোই শোষণ আর নির্যাতন চলতে থাকল। এ অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এমন বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়ে গেল, যেন মুসলিম ও হিন্দুরা একে অপরকে শত্রু গণ্য করে। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসাশিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করে ফেলল। আবার মাদ্রাসাশিক্ষিতদের মাধ্যমে নানা মাজহাব-ফেরকার যে দ্বন্দ্ব আগে থেকেই ছিল তা আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। আর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু দল-মতে যেন আমরা বিভক্ত থাকি তার ব্যবস্থাও করে দিয়ে গেল। ঐক্য অনৈক্যের উপর জয়লাভ করবে এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এটা যেমন কোনো পরিবারের জন্য সত্য তেমনি একটি জাতির জন্যও সত্য। একটি জাতির মানুষগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে তারা যে কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। এর উদাহরণ ১৯৭১। ব্রিটিশদের বিদায়ের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকরা এ দেশের মানুষের উপর যে শোষণ, নির্যাতন চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এদেশের কৃষক, তাঁতি, মুটে, ছাত্র শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনগণ সেদিন শান্তিময় দেশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল। এই বিরাট অর্জন সম্ভব হয়েছিল কারণ এ জাতিটি তখন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ৪৬ বছরে সেই ঐক্য আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে ধরে রাখতে পারি নি। ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণির ফতোয়াবাজি, অপরাজনীতি আর পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত ও হানাহানি, মারামারি, দলাদলী, হত্যা-রক্তপাতে নিমজ্জিত হয়ে গেছি। আজও আমরা তৃতীয় বিশ্বের পশ্চাৎপদ একটি দরিদ্র দেশ। কিন্তু ৪৬ বছর যদি আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে থাকতাম, তবে আমরা নিঃসন্দেহে সর্বদিক দিয়ে পৃথিবীর একটি শীর্ষস্থানীয় জাতিতে পরিণত হতাম। সেই অতীতের ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে আজ যদি আমরা নতুন করে সিদ্ধান্ত নিই যে, আমরা এ জাতিটিকে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিসত্তায় পরিণত করে স্বাধীনতাকে সার্থক করব, তাহলেও আমাদেরকে সেই প্রাকৃতিক

নিয়মটি কাজে লাগাতে হবে- অর্থাৎ আমাদেরকে একাত্তরের ন্যায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ষোল কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এ ঐক্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ধর্মব্যবসা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি ও বৈদেশিক ষড়যন্ত্র। বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে প্রায়ই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি রাজনৈতিক অস্থিরতায় গোটা দেশে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেসময় রাজনীতি ও ধর্মের দোহাই দিয়ে শত শত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আহত, পঙ্গু, অগ্নিদগ্ধ হয়েছে হাজার হাজার মানুষ, কেটে ফেলা হয়েছে হাজার হাজার গাছ, পোড়ানো হয়েছে বহু ঘর-বাড়ি, যান-বাহন। রেল ও সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। জাতীয় রাজনীতিতে আন্দোলনের নামে সহিংসতা সৃষ্টির যে ধারা আমাদের দেশে চালু আছে তার খেসারত দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। তাই সাধারণ মানুষকেই সচেতন হতে হবে ভবিষ্যতে তাদের জীবনে যেন আর এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। একইসাথে দেশ ধ্বংসকারী একটি ইস্যু হলো জঙ্গিবাদ। সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হয়ে একটির পর একটি মুসলিম দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও গত কয়েক বছর থেকে জঙ্গি তৎপরতা যেভাবে বেড়ে গেছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে দেশকে ধ্বংস করার জন্য দেশি-বিদেশি একটি মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। এখন এই অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে জনগণকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা, রাজনৈতিক সহিংসতাসহ যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সংখ্যায় যত বৃহৎই হোক তারা প্রকৃতপক্ষে হয় শক্তিহীন। জনগণের অনৈক্যের সুযোগ নিয়েই কতিপয় সুবিধাবাদী দুস্কৃতকারী যুগের পর যুগ মানবসমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে যায়। কিন্তু আর নয়। ষোলো কোটি মানুষ যদি সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাহলে গুটিকয় দুস্কৃতকারী আর দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না।

এখন আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমরা এমন একটি সমাজ পাব যেখানে কোনো জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, হানাহানি থাকবে না, চুরি-ছিনতাই থাকবে না, কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা থাকবে না, অন্যের অধিকার কেউ হরণ করবে না, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। দু'জন মানুষের ঐক্য যেমন পরিবারকে শান্তিময় করে, তেমনি ষোলো কোটি মানুষের ঐক্য সমাজ ও দেশকে শান্তিময় করবে।

আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়-সত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যায়, অসত্য, বিভক্তি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো যথা ধর্মব্যবসা, অপরাজনীতির, পশ্চিমা সভ্যতার চাপিয়ে দেওয়া মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কারণ কোনো অন্যায়, অসভ্যতা, মিথ্যা মানুষকে শান্তি দিতে পারে না।

স্বাধীনতার এই মাসে বহু অনুষ্ঠান হবে, বহু সেমিনার হবে, নানা আয়োজনে পালন করা হবে স্বাধীনতা দিবস কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণার পর এই ঘোষণাকে বাস্তবায়নের জন্য যে নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগী ঐক্যবদ্ধ মানুষগুলো নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এই স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল তাদের জীবন থেকে আমরা কতটুকু শিক্ষা নিতে পারব সেটাই এখন প্রশ্ন। তাদের আত্মত্যাগকে কেবল দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরাও যদি তাদের মতো দেশ ও দেশের মানুষের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন উৎসর্গ করতে পারি তবেই তাদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে। আসুন আমরা এই স্বাধীনতার মাসে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুনভাবে দেশ গড়ার শপথ নেই।

WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG

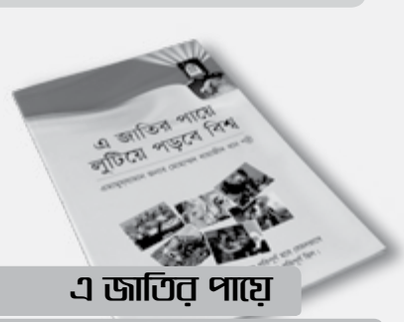

এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব

রসুলাল্লাহ (সা.) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবহেলিত, উপেক্ষিত, পশ্চাৎপদ আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামরিক শক্তিসহ সকল বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অনুরূপভাবে আজ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ষোল কোটি বাঙালিকে হেযবুত তওহীদ আহ্বান করছে, যদি কলেমা-তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি মাত্র শর্ত পূরণ করা হয় তবে এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব।

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

: 01782188237 | 01670174643 | 01711005025 | 01933767725

অপপ্রচারের আড়ালে চাপা পড়ে যায় সত্য

মসীহ উর রহমান

অপপ্রচার বা প্রোপাগান্ডা এমন একটি হাতিয়ার যা যুগে যুগে কালে কালে অপশক্তি ও মিথ্যার ধারক বাহকরা সত্যের বিপক্ষে ব্যবহার করেছে। এ অপপ্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে বহু সাধারণ মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে। বহু মানবতা বিপর্যসৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে, বহু ঘাত সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্র আছে এই মিথ্যা কথাটি প্রচার করে তার ভিত্তিতে সেই দেশটিতে আক্রমণ করে দশ লক্ষাধিক আদম সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। একইভাবে ফেসবুকের একটি পোস্টকে নিয়ে গুজব ও হুজুগ ছড়িয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, মানুষ হত্যা করার মত ঘটনাও আজকাল ঘটছে।

এ প্রসঙ্গে হিটলারের প্রচারমন্ত্রী ভন গোয়েবলস বলেছিলেন, একটা মিথ্যাকে যদি একশবার প্রচার করা হয় তাহলে সেটাই সত্য হিসাবে গৃহীত হয়ে যায়। হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের বেলায় এ উক্তিটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে আন্দোলনটি গত বাইশ বছর ধরে নিরলসভাবে জাতির কল্যাণে, জাতির প্রতিটি মানুষের মুক্তির জন্য, প্রতিটি ইঞ্চি মাটি রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে যেন এ দেশ সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা অপরাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ইত্যাদি দ্বারা কখনো আক্রান্ত না হয় এবং জাতির প্রত্যেকটি মানুষের জীবন নিরাপদ হয়, সমাজে ন্যায়, সুবিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগ্রামের অনন্যা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা এই দীর্ঘসময়ে একটিও আইন ভঙ্গ করি নি, একটিও অপরাধমূলক কাজ করি নি। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় কোনো আন্দোলনের উদাহরণ আশা করি কেউ দেখাতে পারবে না।

প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতানেত্রীদের ঘাড়ে যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি ও বিদেশে অর্থ পাচারের দায়, শত শত গাড়ি পোড়ানো, হাজার হাজার নির্দোষ মানুষের রক্তে তাদের দু হাত রঞ্জিত। তারা ব্যস্ত বিদেশে বাড়ি গাড়ি বানাতে। বিপরীতক্রমে হেযবুত তওহীদের সদস্যরা তাদের বাড়ি-ঘর, জায়গা জমি, মেয়েদের গহনা, গবাদিপশু পর্যন্ত বিক্রি করে, নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করে জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর এই মহান আন্দোলনটিকেই এ পর্যন্ত ব্যাপক অপপ্রচার করে মিথ্যার চাদরে আবৃত করে রাখা হয়েছে। এই অপপ্রচার চালিয়েছে বিশেষত ধর্ম ব্যবসায়ী একটি শ্রেণি এবং ইসলাম বিদ্বেষী গণমাধ্যমকর্মীদের একটি শ্রেণি।

ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটি সাধারণ মানুষের সামনে হেযবুত তওহীদকে খ্রিস্টান, ইহুদির দালাল, খ্রিস্টানদের কাছ থেকে টাকা পায়, কাফের, মুর্তাদ ইত্যাদি নানা রকম মিথ্যা গুজব রটিয়ে দিয়েছে যেন মানুষ হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক বিভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে থাকে। তাদের হাতে আছে ফতোয়ার অস্ত্র, যে কারোর বিরুদ্ধে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ জনগোষ্ঠীকে উত্তেজিত করে তাদের ঈমানকে ভুল পথে নিয়ে জনরোষ সৃষ্টি করতে ও হামলায় প্ররোচিত করতে তারা পটু। এর ফলে বহু জায়গায় হেযবুত তওহীদ অহেতুক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ অপপ্রচারের জন্য জানতেই পারেনি যে হেযবুত তওহীদ সত্যই মো'মেন, আল্লাহ রসুলের প্রকৃত ইসলামকে নিয়ে তারা কাজ করছে, তারা ইসলামের প্রকৃত কল্যাণকামী, তারা মুসলমানদের দুনিয়াজোড়া দুর্গতি দুঃখ লাঘবের জন্য কাজ করছে। একজন প্রকৃত মো'মেনের কাজ করছে হেযবুত তওহীদ- এই কথাটা আজ পর্যন্ত এই অপপ্রচারের কারণে জনসম্মুখে ব্যাপকভাবে বলার সুযোগই পাই নি আমরা।

প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতানেত্রীদের ঘাড়ে যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি ও বিদেশে অর্থ পাচারের দায়, শত শত গাড়ি পোড়ানো, হাজার হাজার নির্দোষ মানুষের রক্তে তাদের দু হাত রঞ্জিত। তারা ব্যস্ত বিদেশে বাড়ি গাড়ি বানাতে। বিপরীতক্রমে হেযবুত তওহীদের সদস্যরা তাদের বাড়ি-ঘর, জায়গা জমি, মেয়েদের গহনা, গবাদিপশু পর্যন্ত বিক্রি করে, নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করে জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর এই মহান আন্দোলনটিকেই এ পর্যন্ত ব্যাপক অপপ্রচার করে মিথ্যার চাদরে আবৃত করে রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ইসলামবিদ্বেষী একটি মহল যাদের হাতে বন্দী রয়েছে গণমাধ্যমগুলো তারা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপপ্রচার করে গেছে বিগত ২২ বছর। আজকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চলছে, সম্মিলিতভাবে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তারা ইসলামকে টার্গেট করেছে, মুসলমানকে টার্গেট করেছে। তারা এই প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে যে, মুসলমান সন্ত্রাসী, মুসলমান জঙ্গি, মুসলমান কূপমণ্ডূক, মুসলমান সাম্প্রদায়িক, মুসলমান খারাপ। যারা ইসলামের কথা বলবে তাদের সবাইকে পশ্চিমা ভাবাদর্শের এই শ্রেণিটি এক পাল্লায় মাপার নীতি নিয়েছে, এখানে বিচার-বিবেচনার কোনো বালাই নেই, কোনো প্রয়োজন নেই। মানদণ্ড হচ্ছে ইসলাম চায় কিনা, যারা চায় তারাই জঙ্গিবাদী, তারাই মূর্খ, অন্ধ।

অথচ হেযবুত তওহীদ জঙ্গি তো নয়-ই বরং সর্বশক্তিতে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষাগুলো তুলে ধরে মানুষের বিপথগামী ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আদর্শিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংগ্রামের কথা ওই ইসলাম বিদ্বেষী শ্রেণিটি তাদের পত্র-পত্রিকায় প্রচার করে না, উল্টো তারা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মিথ্যা রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশ করেছে যেখানে তারা এই আন্দোলনকে জঙ্গি, সন্ত্রাসী, নিষিদ্ধ, বিতর্কিত, সন্দেহজনক, উগ্রপন্থী, দেশীয় ও মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিভিন্ন নিষিদ্ধ জঙ্গি দলের সঙ্গে যোগসাজস আছে ইত্যাদি অপশব্দ ব্যবহার করেছে। যদিও বাংলাদেশে হেযবুত তওহীদ যেভাবে নিজেদের অর্থ ও শ্রমে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে লক্ষাধিক জনসভা, পথসভা, মিছিল, র‍্যালি, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, বই-হ্যান্ডবিল প্রচার করেছে তার শতভাগের একভাগও কেউ করে নি। সেখানে আমরা সর্বসাধারণের সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাটা উপস্থাপন করছি। এ কাজে আমাদের কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ নেই, রাজনৈতিক অভিসন্ধি বা খ্যাতির লিপ্সা নেই। অনন্য, অসাধারণ, নজিরবিহীন এ উদ্যোগকে সেই ইসলামবিদ্বেষী গণমাধ্যমগুলো তাদের বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। বর্তমানের চরম স্বার্থপরতার যুগে কেউ যে নিঃস্বার্থভাবে জাতির জন্য, দেশের জন্য, মানবতার জন্য কাজ করতে পারে এ কথা তারা বিশ্বাসই করতে চায় না। তাদের ডানচোখ তো অন্ধ যে কথা আল্লাহর রসুল বলে গেছেন যে, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ থাকবে।

আমাদের কথা হচ্ছে, এই যুগে মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছানোর জন্য গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ গণমাধ্যমই সুস্পষ্টরূপে পক্ষপাতদুষ্টতায় আক্রান্ত। তারা বিপুল উৎসাহে ক্রাইম রিপোর্ট ও বিনোদনমূলক সংবাদ প্রচার করেন কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণে হেযবুত তওহীদের এই যে আত্মত্যাগ সেটা তাদের যেন দৃষ্টিগোচর হয় না, যেন হেযবুত তওহীদের কোনো প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি দিলে তাদের মানহানি হবে। বস্তুত আমরা কারো স্বীকৃতির কাঙালও নই। শুধু এটুকু বলতে পারি, তারা যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে এই মানদণ্ডে উপনীত হতে পারতেন যে, ভালো কথা যে-ই বলুক সেটাকে প্রচার করা হবে আর অপকর্ম যে-ই করুক তার নিন্দা করতে হবে তাহলে অন্তত হেযবুত তওহীদের তুলে ধরা যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যগুলো থেকে এমন আদর্শিক উপাদান তারা সংগ্রহ করতে পারত যা প্রচার করলে জাতির সবাই জানতে পারত, জঙ্গিবাদের ভ্রান্তিগুলো কোথায়, ধর্মব্যবসার ক্ষতিকারক দিকগুলো কী এবং কীভাবে ধর্মের অপব্যবহারের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। দেশটা যেন ইরাক সিরিয়ার মতো সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে না পারে, সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর উপায় তারা খুঁজে পেত।

আমাদের অনেক মিডিয়াকর্মীর মধ্যেও এমন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে যে, 'ইসলামের কথা যারাই বলে তারা সবাই এক।' ভাবখানা এমন যে, 'ইসলামী দল? সবই এক। হেযবুত তওহীদ-হিজবুত তাহরীর সব এক। এখন যারা জঙ্গিবাদ করে না, ভবিষ্যতে করবে। মুসলমান মানেই জঙ্গি, মুসলমানরা কোর'আন থেকে জঙ্গিবাদ শেখে, মহানবী (সা.) নিজে জঙ্গি ছিলেন ইত্যাদি (নাউজুবিল্লাহ)।' এই ধারণা পশ্চিমাদের থেকে ধার করা। পশ্চিমারা এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে ইসলামবিদ্বেষী রাজনীতি করে। এ ধারণার উপর ভিত্তি করেই তো আমেরিকা থেকে শুরু করে গোটা ইউরোপে, এশিয়ায়, রাশিয়ায় এখন একটাই ইস্যু- মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন, মুসলমান মানেই খারাপ, মুসলমান মানেই জঙ্গি, এদেরকে হত্যা কর, জেলে দাও, বিতাড়ন কর ইত্যাদি।

তাদের ঐ প্রচারণাতে আমাদের এক শ্রেণির গণমাধ্যমগুলোও প্রভাবিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশে বলব, বৃক্ষের মধ্যে বহু বৃক্ষ আছে ক্ষতিকর, বহু বৃক্ষ আছে উপকারী, এমনও উপকারী, জীবন রক্ষাকারী। একজন প্রকৃত বৃক্ষপ্রেমী বা উত্তম কৃষক হলেন তিনি, যিনি ভালো বৃক্ষ, মন্দ বৃক্ষ বোঝেন, নাহলে তার ভোগান্তি হয়। গণমাধ্যমকর্মীদেরকেও তা বুঝতে হবে, কারণ তারা একটি মহান দায়িত্ব পালন করছেন, সমাজের অন্য দশজনের চাইতে এক্ষেত্রে তাদের দায়বদ্ধতা বেশি, কারণ তাদের দৃষ্টি দিয়েই সমাজ কোনো কিছুকে দেখতে পায়।

আজকে যারা রাজনীতি করছেন তারা অধিকাংশই ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য রাজনীতি করছেন, এই রাজনীতি করতে গিয়ে তারা দেশের সম্পদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করছেন, দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছেন। এই সব রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের প্রচার করতে আপনাদের কোনো কার্পণ্য নেই, দ্বিধা নেই। অন্যদিকে যে আন্দোলনটা তাদের বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, সোনা-দানা, মেয়েদের স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করে দিয়ে, জাতি যেন জঙ্গিবাদে না জড়িয়ে পড়ে জাতির মধ্যে যেন সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য মানুষকে সচেতন করে যাচ্ছে সে আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদের কেন এত দ্বিধা? আমাদের মাননীয় এমাম বলেছেন- প্রয়োজনে রক্ত দেব, তবুও আমাদের দেশকে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান হতে দিব না। এত বড় কথা তিনি বলেছেন, এত বড় শপথ তিনি নিয়েছেন, এটা তার মুখের কথা না, এটা তার আত্মার কথা- তাহলে এতো কল্যাণকামী একটা আন্দোলনকে কী করে অন্যদের সাথে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়?

সকল গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে বলব, আপনারা আমাদের বিষয়গুলোকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন, একটু সময় দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবেন, আমাদের অনুভূতিকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবেন। আমরা নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের প্রকৃত রূপটা সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এর প্রয়োজনীয়তা কোথায় তাও আপনাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে।

প্রশাসনেরও কেউ কেউ এই সব অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে হেযবুত তওহীদকে সীমাহীন হয়রানি করেছে। আজ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক মিথ্যা মামলার বোঝা হেযবুত তওহীদকে টানতে হয়েছে। প্রশাসন যদিও বলে যে আমরা তদন্ত করে দেখেছি, হেযবুত তওহীদ জঙ্গি না, সন্ত্রাসী না, খ্রিস্টানও না তখন ঐ অপপ্রচারকারীরা সুর পাল্টে বলেন, "হ্যাঁ, আজ হয়তো জঙ্গি না, তবে কাল তো হতেও পারে, তাই না? এই যে দেখুন, অমুক অমুক দল শুরুতে ভালোই ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই জঙ্গিপনা শুরু করল। যেহেতু হেযবুত তওহীদও ইসলাম ধর্মের কথা বলে, সুতরাং একটা সময় ঠিকই তারা জঙ্গি হবে।"

আজকে আমরা আমাদের প্রিয় দেশবাসীকে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে হেযবুত তওহীদকে জানার জন্য বাইশটা বছর কি যথেষ্ট নয়? এই আধুনিক যুগে একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে তাদের গোয়েন্দা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা একটি ছোট আন্দোলনের বিষয়ে সঠিক তথ্য অবহিত হওয়া কি এতটাই দুরূহ? নাকি এটা তাদের ব্যর্থতা? এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে, তথ্য আদান প্রদানের ইলেকট্রনিক গতির যুগে একটি আন্দোলনের মোটিভ, তাদের নীতি, কার্যক্রম বোঝার জন্য, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ করার জন্য প্রায় দুইটি যুগ তারা সময় পেয়েছেন। সময় পেয়েছেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকরাও। তারপরও কেন তারা অনুমানপ্রসূত কথা বলবেন, কেন এমন মন্তব্য করবেন যা তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হবে? এ কোন মূর্খতা, এ কোন অযোগ্যতা?

এই বাইশ বছরে আপনারা নিশ্চয়ই হেযবুত তওহীদের হাজার হাজার জনসচেনতামূলক অনুষ্ঠান দেখেছেন, হাজার হাজার বক্তব্য দেখেছেন, বই পড়েছেন। সেখানে কোনো একটা শব্দও আপনারা কি পেয়েছেন হেযবুত তওহীদ ইসলাম বিরোধী। একটি শব্দও কি পেয়েছেন যে হেযবুত তওহীদ জঙ্গিবাদকে অনুমোদন করছে? কেউ দেখাতে পারবেন না। প্রকৃত সত্য হলো হেযবুত তওহীদ প্রকৃত মো'মেন হওয়ার চেষ্টা করছে, মানুষকে ইসলামের নামে সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা থেকে বাঁচাতে ইসলামের প্রকৃত রূপটি তাদের সামনে তুলে ধরছে। সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত হয়ে সরকার যখন দিশেহারা তখন সামরিক বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানীরা সবাই বলছেন একটি পাল্টা আদর্শ লাগবে। এই পাল্টা আদর্শের কথা সবাই বলেন কিন্তু সেই আদর্শটি কারো কাছেই নেই। যুক্তি, তথ্য, প্রমাণ ইত্যাদি দিয়ে হেযবুত তওহীদ সেই আদর্শটি তুলে ধরছে। এই তুলে ধরাটা যেমন একদিকে আমাদের সামাজিক কর্তব্য অপরদিকে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, মানবাধিকার, ধর্মীয় অধিকার।

আমরা যখন মাঠে নেমেছি তখন মানুষ ধীরে ধীরে আমাদের বিষয়ে জানতে পারছে। সত্য প্রকাশিত হওয়ার অর্থই মিথ্যা কেটে যাওয়া। অপপ্রচারের মেঘও ক্রমেই কেটে যাচ্ছে । মানুষ আমাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করছে। তবু এখনও যারা আমাদের বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা নিয়ে বসে আছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব আপনার অনর্থক সন্দেহ না করে আমাদের সঙ্গে মিশুন, আমাদের বই পড়ুন, কার্যক্রম দেখুন। এ পর্যন্ত প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত শত শত তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দিয়েছেন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্ত করে এই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে যে, হেযবুত তওহীদের কোনো জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসবাদী, রাষ্ট্রবিরোধী, সমাজবিরোধী, নাশকতামূলক, ধর্মবিরোধী কোনো কার্যক্রম তারা খুঁজে পায় নি। অর্থাৎ হেযবুত তওহীদ নির্দোষ, নিরপরাধ। এত আদালতের প্রতিবেদন, এত জনসমর্থন, এত নৈতিকতার উপর দণ্ডায়মান আন্দোলন দ্বিতীয়টি আর নেই। কাজেই কেউ যেন আর হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে না পারে আমরা সর্বসাধারণকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

কমিউনালিজম - আসাবিয়াত - সাম্প্রদায়িকতা

রিয়াদুল হাসান

সাম্প্রদায়িকতা আল্লাহর নয়, ইবলিসের দান

সাম্প্রদায়িকতা মানবজাতির জীবনে একটি অভিশাপের নাম। ধর্মের নামে বিভক্তির যে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল মানবজাতিকে বহু ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে তারই একটি কারণ এই সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মগুলো মানবজাতিকে বিভক্ত করতে আসে নি, এসেছিল যুক্ত করতে। রবীন্দ্রনাথ এটাই প্রার্থনা করেছিলেন যে, যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ/সঞ্চার করো সকল কমেয় শান্ত তোমার ছন্দ। নবী-রসুল অবতারগণ ঘৃণা বিস্তার করতে ধরার বুকে আবির্ভূত হন নি, তারা এসেছিলেন ঘৃণা বিদ্বেষ লুপ্ত করতে, কিন্তু তাঁদের অনুসারীরা দুঃখজনকভাবে তাদের নামেই ঘৃণা বিদ্বেষের প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন ধরার বুকেই। কী পরিহাস, তাই না?

বর্তমান এই সময়টিতে ধর্ম বিশ্ব রাজনীতির প্রধান ইস্যু। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই মানুষ যখন একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে তখন বিভিন্ন অনুসারীদের মগজের মধ্যে বিরাজিত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে পৃথক করে রেখেছে। যার দায় স্বভাবতই গিয়ে পড়ছে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' সেই ধর্মের ঘাড়ে। আমরা দেখছি যে মানুষের মানুষ পরিচয় গৌণ হয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় পরিচয়ের আড়ালে। কিন্তু একজন মুসলমান সর্বপ্রথমে একজন মানুষ, তারপরে সে মুসলমান। একইভাবে একজন হিন্দুও সর্বপ্রথমে একজন মানুষ, তারপরে সে হিন্দু। তাই কোনোভাবেই এক ধর্মের অনুসারী অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীর উপর হামলা চালাতে পারে না। কারণ মানুষ হিসাবে তারা একে অপরের ভাই, তারা এক পিতা-মাতার সন্তান। নজরুল ইসলাম হিন্দু ও মুসলমানের এই সম্পর্ককে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান/মুসলিম তার নয়ন-মণি হিন্দু তাহার প্রাণ।

সাম্প্রদায়িকতা কী?

বহুজনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের আলোকে সাম্প্রদায়িকতার বহুরকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সবগুলো সংজ্ঞা নিয়ে পর্যালোচনা করলে নিবন্ধের কেবল কলেবরই বৃদ্ধি পাবে। তথাপি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদত্ত কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা আমি উল্লেখ করছি। ইংরেজি Communalism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। ইংরেজি মেরিয়াম ওয়েবস্টার ডিকশনারি ইংরেজি শব্দ কমিউনালিজমকে সংজ্ঞায়িত করেছে Loyalty to a sociopolitical grouping based on religious or ethnic affiliation. এই অভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে কমিউনালিজম বা সাম্প্রদায়িকতাকে নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় নি। বরং কোন বৃহৎ সমাজের অন্তর্গত নিজস্ব গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যকে সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সংজ্ঞা তো আমাদের দেশের প্রচলিত সংজ্ঞা বা বাস্তবতার সঙ্গে যায় না। তাই আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের নিজস্ব শব্দ ও সংজ্ঞার দিকে। এখানকার সমকালীন চিন্তায় সাম্প্রদায়িকতার দ্বিতীয় অর্থ রয়েছে। কী সেটা?

গোটা ভারতবর্ষেই সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার এখন মুসলমানদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়, 'সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে এক ধরনের মনোভাব। কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে'।

এ সংজ্ঞার আলোকে বোঝা গেল, সম্প্রদায় চেতনা আর সাম্প্রদায়িকতা এক না। সম্প্রদায় চেতনা

থেকে নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয়ে পরিচিত হতে চাওয়া, নিজ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ভালোবাসা ইত্যাদিকে সাম্প্রদায়িকতা বলে না। কিন্তু তা যখন অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ আর হিংসা হিসেবে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন সেটাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। নিজ দলের অন্যায়কেও সমর্থন করা আর অপর দলের ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করাই সাম্প্রদায়িকতা। বর্তমানে আমাদের গণতান্ত্রিক-সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলগুলো হিন্দু-মুসলিম, শিয়া-সুন্নী, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টেন্টদের মত প্রত্যেকে একেকটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এমন কি ক্রিকেট খেলা নিয়েও ভারত বিরোধিতা, পাকিস্তান বিরোধিতার ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের ইসলামের প্রতি অনুরাগ নিয়েও এক ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মনোবৃত্তি ছড়িয়ে গেছে।

ব্রিটিশ যুগে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি

আমাদের উপমহাদেশে এই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষটা সৃষ্টি করে গেছে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি। তারা শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই বিভক্তি ও শত্রুতাকে জাতির মনে মগজে গেড়ে দিয়ে গেছে, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। তারা তাদের পরিকল্পনা অনুসারে সর্বপ্রথম দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রণয়ন করে যার ফলে তারা জাতিকে ভাগ করো, শাসন করো (Divide and Rule) নীতি অনুসারে দুভাগে ভাগ করে দিতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা মুসলমাদের জন্য কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন যার প্রথম ছাব্বিশজন প্রিন্সিপাল ছিল খ্রিস্টান ও হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ইংরেজদের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষ মুসলমান মোঘলদের শাসনাধীন ছিল। তখন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষভাবে ছিল না।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ বিষয়টি বিশদভাবে "সাম্প্রদায়িকতা কী ও কেন" শীর্ষক একটি নিবন্ধে তুলে ধরেন। সেখানে তিনি বলেন, "আমাদের দেশে তো বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করে এসেছে। হিন্দু কৃষক ও মুসলমান কৃষকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে নি। তারা একে অপরকে উৎখাত করতে চায় নি। নদীতে হিন্দু জেলে ও মুসলমান জেলে এক সঙ্গে মাছ ধরেছে। তাঁতিরা তাঁত বুনেছে। সাধারণ মানুষ একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। মানুষ একই পথ ধরে হেঁটেছে, একই বাজার হাটে গিয়ে কেনাবেচা করেছে, থেকেছে একই আকাশের নিচে। কে হিন্দু কে মুসলমান তা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করেনি, নাক সিঁটকায়নি। তাহলে? সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করল কারা? তৈরি হলো কী ভাবে? কেন?

সাম্প্রদায়িকতা মূলত শুরু করল দুই দিকের দুই মধ্যবিত্ত - হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত। ব্রিটিশ যুগেই এই ঘটনার সূচনা। তার আগে সম্প্রদায় ছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠায় উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তের তুলনায় অন্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে ছিল। মুসলিম মধ্যবিত্ত দেখল জায়গা তেমন খোলা নেই, অন্যরা দখল করে নিয়েছে। শুরু হলো দু'পক্ষের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যারা দখল করে রেখেছে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। শাসক ব্রিটিশরা এ ব্যাপারে দু'পক্ষকেই উস্কানি দিল যাতে তাদের রেষারেষিটা আরো বাড়ে। বাড়লে ব্রিটিশের সুবিধা, কেন না ঝগড়াটা তখন শাসক-শাসিতের মধ্যে থাকবে না, হয়ে দাঁড়াবে হিন্দু-মুসলমানের।" [প্রতিদিনের সংবাদ ১৭ জুলাই ২০১৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে গোত্রপ্রীতি

ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতা একটি নিকৃষ্ট মনোভাব। এর আরবি হচ্ছে আসাবিয়াত। আসাবিয়াত মানে কী এই প্রশ্ন করলে রসুলাল্লাহ বলেন, "অন্যায় কাজে স্বগোত্র-স্বজাতির পক্ষে দাঁড়ানো" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০৭৮)। তদানীন্তন আরবে গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ও ছিল। তবে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি গোত্রগুলোর মধ্যেই বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একটি গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে শতবর্ষী যুদ্ধ চালিয়ে যেত।

অন্য একটি হাদিসে আল্লাহর রসুল বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে আসাবিয়াতের দিকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ অন্যায় কাজে নিজ দেশ, দল, গোত্র, জাতিকে সাহায্য করতে বলবে) সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে এমন সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় (মুসলিম নয়) (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০৮০)।

সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি কোনোভাবেই ইসলাম বা হিন্দু ধর্মের শিক্ষা নয়, এর সুগভীর রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য রয়েছে। সেটা উপলব্ধি না করার দরুনই আজ আমাদের হিন্দু-মুসলিম ধর্মগুরুরা তাদের বক্তৃতায় অন্য ধর্মের প্রতি বিষোদগার করে সস্তা জনপ্রিয়তা আর অর্থ উপার্জন করে থাকেন। এর পরিণামে জাতির মনে মগজে কী বিভক্তির বিষ তারা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন আর তার সুদূরপ্রসারী কুফল কী সেটা উপলব্ধি করার মতো বোধশক্তি তাদের নেই। তাদের এই অপকর্মের ফলেই জাতির একটি বড় অংশ উগ্র ধর্মান্ধতায় আক্রান্ত, তাদেরকে যেই বলা হয় অমুক সম্প্রদায়ের লোক ইসলামের অবমাননা করেছে অমনি তারা যাচাই বাছাই না করে জান্তব আক্রোশ নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে প্রায়ই আমাদের

দেশে হিন্দুদের পল্লীতে, বৌদ্ধদের মন্দিরে হামলা হয়, হতাহত হয়, আগুনে বাড়ি ঘর ভস্মীভূত হয়। ঠিক একই ঘটনা যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘু সেখানে মুসলমানদের উপরও হয়। ভারতে হিন্দুত্ববাদী সরকারের ছত্রছায়ায় গোরক্ষা আন্দোলনের নামে বহু মুসলমানকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, মায়ানমারে মুসলমান পরিচয়ের অপরাধে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে জাতিগত নিধন চালিয়ে দেশ থেকে উৎখাত করে দিয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সাং সুচি এখন পর্যন্ত এই গণহত্যার বিরুদ্ধে মুখও খোলেন নি। এই রকম অন্যায় যেন দানা বাঁধতে না পারে সে জন্য আল্লাহর রসুল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতেই নিষেধ করেছেন। কেননা বিদ্বেষ একটা সময়ে বেড়ে উঠে এমন পর্যায়ে চলে যায় যখন তা দাঙ্গায় রূপ নেয়, দাঙ্গা থেকে শুরু হয় যুদ্ধ মহাযুদ্ধ।

বিশ্বরাজনৈতিক অঙ্গনে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা

বর্তমানে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে আমরা বসে আছি সেটাও মূলত সেই পাশ্চাত্যের মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব তথা সাম্প্রদায়িকতারই পরিণতি। তারা টার্গেট নিয়েছে, লক্ষ্য স্থির করেছে যে মুসলিমদের ধরাপৃষ্ঠে রাখবে না, তাদের কোনো নিজস্ব মতামত থাকবে না, ধর্ম থাকবে না, সংস্কৃতি থাকবে না, জীবনবিধান থাকবে না, দেশও থাকবে না। তাদের বিশ্বনেতারা এ ধরনের কথা প্রকাশ্যে অনেকে বলে থাকেন অনেকে কলাকৌশলপূর্ণ শব্দের খোলস পরিয়ে একই সাম্প্রদায়িক ঘৃণার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। দুই তিনটা উদাহরণ দেই:

- ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।' এ ব্যাপারে তিনি বিজ্ঞানী ইলন মাস্ককে প্রস্তাব দেন, যদি তিনি তার রকেটে করে মুসলিমদের মঙ্গলে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তা হলে তাকে তার সরকারের পরিবহন মন্ত্রীর পদ দেবেন। (১৮ জুন ২০১৬, দৈনিক ইত্তেফাক)।
- আফগানিস্তান হামলার প্রাক্কালে এই আগ্রাসনকে জর্জ বুশ ক্রুসেড হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, This crusade, this war on terrorism is going to take a while. অর্থাৎ আসন্ন ক্রুসেড, আসন্ন সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধটি সমাপ্ত হতে কিছুটা সময় লাগবে (বিবিসি, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১)।
- বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু অং সুংঙ্গা পং বলেন, "শুধু বার্মাতে হামলা নয়, প্রয়োজনে বাংলাদেশে আমাদের পুরানো ভূমি উদ্ধারে হামলা করা হবে। বাংলাদেশের ফেনী পর্যন্ত আমাদের পুণ্য মাতৃভূমি। সুযোগ পেলে উদ্ধারে নেমে পড়বো।"

কথিত সুশীলদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি

আমাদের শিক্ষিত সেক্যুলার ধ্যান-ধারণার লোকেরাও কিন্তু সাম্প্রদায়িক চিন্তার ঊর্ধ্বে যেতে পারছেন না। তারাও পশ্চিমাদের চশমা পরে ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং নিজেদের মুসলিম নাম পরিচয় নিয়ে নিদারুণ হীনম্মন্যতায় ভুগছেন। তাদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই যখন তারা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বাছ বিচার পরিহার করে মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় ধর্মের সকল ইতিবাচক ভূমিকাকেই অস্বীকার করেন এবং ধর্ম মানেই অচ্ছুত, পরিত্যাজ্য, জঘন্য বলে ভাব প্রকাশ করেন। এটাও এক প্রকার অন্ধত্ব ও সাম্প্রদায়িকতা। তাছাড়া নির্যাতিত জনগোষ্ঠী মুসলিম হলে সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকা পক্ষান্তরে নির্যাতিতরা হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, সাঁওতাল বা নির্দিষ্ট ধর্মহীন সুফিবাদী, বাউল সম্প্রদায় হলে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠাও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রকাশ। নির্যাতিত মুসলিমদের পাশে দাঁড়ালে পাছে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, গায়ে মুসলিম তকমা লেগে যেতে পারে এজন্য তারা অন্যান্য সকল নির্যাতনের প্রতিবাদ করলেও রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়।

এখন কী করণীয়?

এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে আজ মানবজাতি জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে, কিন্তু এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কোনো পথ তাদের সামনে নেই। মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার মত- একটি দল বলছে ধর্মকেই বাদ দিতে হবে। কিন্তু সেটা আদৌ সম্ভব নয়, ধর্মহীনতার ইতিহাস নবীন কিন্তু ধর্মের ইতিহাস সহস্র লক্ষ বছরের প্রাচীন। একে উৎখাত করতে চেয়েছিল কম্যুনিস্টরা। রাশিয়ার বহু মসজিদ গির্জা ভেঙে ফেলা হয়েছিল স্ট্যালিনের যুগে কিন্তু এখন তাদের প্রেসিডেন্ট পুতিন খোদ মস্কো শহরের বুকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদটি নির্মাণ করলেন। ধর্মের কাছে নাস্তিক্যের পরাজয়ের এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে?

অন্যান্য ধর্মের কথা বাদ দিলাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে আবির্ভূত সর্বশেষ রসুল ও সর্বশেষ কেতাবের অনুসারী মুসলিমরা যাদের ঈমানের অন্যতম শর্ত হচ্ছে পূর্ববর্তী সকল ধর্মের নবী রসুল ও কেতাবের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস রাখা তারা কী করে সাম্প্রদায়িক হলো সেটা

কিছুতেই আমার বুঝে আসে না। এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা বিস্তারের শিক্ষা তারা কোথায় পেল? আল্লাহ-রসুলকে নিয়ে কেউ কটূক্তি করলে একজন ঈমানদার মানুষের রক্তে আগুন ধরে যাবে এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু সেই আগুন জ্বালিয়ে এমন কিছু করা মুসলিমের সাজে না যার দরুন তার নিজ ধর্মের অপমান হয়, নিজ নবীর অপমান হয়। আল্লাহর রসুল তো আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁকে গালি দেওয়া হলে কী করতে হবে সেটাও আমাদেরকে তাঁর জীবনী থেকেই শিখতে হবে, নয় কি? তিনি কী করেছেন, আল্লাহ কী বলেছেন এ বিষয়ে তার জীবনকর্মের দিকে একটু দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক।

- আল্লাহর রসুলকে গালি দেওয়া তো নতুন কিছু নয়। ইসলামের বিরোধীরা তাঁকে গালি দেবে এটাই স্বাভাবিক। তাঁর জীবদ্দশাতেও তাঁকে মক্কার কাফেররা বহু গালিগালাজ করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, গুজব রটনা করেছে। তাঁকে জাদুকর, গণক, মিথ্যাবাদী, ভণ্ড বলে প্রচার করেছে। কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবিরা কি একটিবারও বিরোধী কাফেরদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছেন, তাদেরকে হামলা করেছেন বা গোপনে হত্যা করেছেন? না, ঈমানী চেতনা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তা করেন নি। তাঁরা কেবল একটি কথার দিকে মানুষকে আহ্বান করে গেছেন যে, তোমাদের আমাদের একজনই স্রষ্টা। এসো আমরা আমাদের জীবনে তাঁকে ছাড়া আর কোনো হুকুমদাতা না মানি। এটাই হচ্ছে তওহীদ। আরবরা তাদের গোত্রপতিদের হুকুম মানতো। একটা পর্যায়ে তারা ঠিকই রসুলাল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। তিনি ঐ একটি কথার উপর আরবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তখন মুসলমানদের শক্তির সামনে মাথা তোলার মত আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না আরবে, নবীজীকে গালি দেওয়ার হিম্মতও ছিল না কারো। এক সময় যারা তাঁকে গালি দিত তারাই এসে ভুল বুঝতে পেরে তাদের তলোয়ার নবীজীর পায়ে সোপর্দ করে বলেছিল, এই তলোয়ার এখন থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবতার মুক্তির সংগ্রামে ব্যবহৃত হবে। মুসলিমরা যুদ্ধ করে দাঙ্গা করে না। দাঙ্গা হলো ফেতনা, এটা করে কাপুরুষরা। যার তার বিরুদ্ধে হামলা করলেই সেটা যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ ঘোষণা করে কেবল রাষ্ট্র। রসুলাল্লাহ রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পূর্বে কোনো প্রকার সামরিক পদক্ষেপ নেন নি, তবে রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পর অপরাপর রাষ্ট্র যেভাবে প্রতিরক্ষা নীতি, যুদ্ধনীতি মোতাবেক যুদ্ধ-সন্ধি, সমর কৌশল প্রয়োগ করে সেটা রসুলও করেছেন। সুতরাং মুসলিমদেরও এখন একটাই কর্তব্য, আল্লাহর তওহীদের স্বীকৃতি যারাই দেবে অর্থাৎ যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে তাদেরকে নিয়ে একটি শক্তিশালী জাতিসত্ত্বা গড়ে তোলা, শিয়া সুন্নী, হানাফি-হাম্বলি, গণতান্ত্রিক-সাম্যবাদী, আরব-অনারব ইত্যাদি মনগড়া বিভক্তির দেয়াল ভেঙে ফেলা, নিজেরা হানাহানি না করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তাহলেই কেউ আর আল্লাহ-রসুলের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে সাহস করবে না। আমাদের অনৈক্যই তাদের এই বিদ্বেষ প্রচারের ভিত্তি। একদিকে হুজুগের হুঙ্কার আর তওহীদী জনতার নামে সাম্প্রদায়িক হামলা অপরদিকে নিজেরা ফেরকা মাজহাব নিয়ে কামড়া কামড়ি করলে, নিজেদের অস্ত্র অপর মুসলিমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে ইসলামবিদ্বেষীদের যুক্তি ও শক্তি আরো বৃদ্ধিই পাবে, ধর্ম অবমাননা ফেরানো যাবে না, আল্লাহ-রসুলকে লক্ষ করে গালিগালাজ আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান ইসলাম অবমাননা, ইসলামভীতি ও বিদ্বেষ তাই গত এক শতাব্দীর বাস্তবতা।
- আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, "তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তোমারা তাদেকে গালি দিও না। কারণ এতে তারাও সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।" (সুরা আল-আন'আম ১০৮)। আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। তাই হে নবী, আপনি তাদের শাস্তি দেয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করুন, তাদের উপদেশ দিন এবং তাদের কাজের পরিণতির কথা স্পষ্টভাবে বলে দিন (সুরা নিসা ৬৩)।
- যারা ইসলামবিদ্বেষী তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যৌক্তিক জবাব দিতে হবে, হামলা করে জ্বালাও পোড়াও হত্যাকাণ্ড করলে সেটা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ হবে, ইসলামেরই

বদনাম হবে, মানুষ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এতে চূড়ান্ত বিচারে ইসলামেরই ক্ষতি করা হবে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, হে নবী! আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য, উত্তম যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। (সুরা নাহল ১২৫)।

- আদম (আ.) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত আগত প্রতিটি ধর্মই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে পড়ে বিকৃত হয়ে গেছে। যে ধর্মগুলো ছিল একত্ববাদী, সেগুলো হয়ে গেছে পৌত্তলিকতায় পূর্ণ। তাদের কথা কোর'আনে এসেছে। একইভাবে বিকৃত হয়ে যাওয়া ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মগুলোর কথাও এসেছে। আল্লাহ কোর'আনে কোথাও এই সব ধর্মের নির্দোষ অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেন নি। তিনি বলেছেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না" (সুরা বাকারা: ১৯০)। ইসলামের লড়াই মূলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। যেখানে অন্যায় অবিচার বিরাজিত থাকবে সেখানেই উম্মতে মোহাম্মদী ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে যাবে। এখানে কে সেই অন্যায়ের ধ্বজাধারী সেটা বিবেচ্য নয়, সে হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক এমন কি মুসলিম দাবিদারও যদি হয়।
- আল্লাহর রসুল চেষ্টা করেছেন সব ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে কেবল একটি কথার উপর যে, আমাদের সবার প্রতিপালক একজন, স্রষ্টা একজন। আসো আমরা তাঁর হুকুম মানি। আল্লাহর রসুলকেও আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে নির্দেশ দিচ্ছেন অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে বলার জন্য যে, "হে আহলে-কেতাবগণ! এমন একটি বিষয়ের দিকে এসো- যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান- যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে প্রতিপালক বলে মানবো না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম। (সুরা আল ইমরান ৬৪)। এ কথার মানে হলো, তোমরা যদি নাও আসো, আমরা তওহীদের সাক্ষ্য দিলাম। আমরা মুসলিম হলাম। এর পর অন্য ধর্মের লোকদের জীবনযাপনকে নিরাপদ করা ও তাদের উপাসনার অধিকারকে সংরক্ষণ করাও ইসলামের আদর্শ।

এখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে জাতিকে মুক্ত করতে প্রয়োজন এ সম্পর্কে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা এবং প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদেরকে যার যার ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে নেওয়া। মানুষকে এটা বোঝানো যে সকল ধর্মই একই স্রষ্টার পক্ষ থেকে এসেছে, তাদের ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যেও বহু সত্য নবী-রসুল রয়েছেন যারা তাদের কেতাবগুলো আজকে বিকৃত হয়ে গেলেও আদিতে সেগুলোও আল্লাহরই কেতাব ছিল। এখন তো ইসলামের চর্চাও সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। সুতরাং সবাইকে আবার সকল ধর্মের মর্মকথা-সবার উর্ধ্বে মানবতা এই চরম সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে এক পরিবারভুক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

ইসলামের প্রকৃত সালাহ্

আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মতে মোহাম্মদীর যে চরিত্র অপরিহার্য সেই চরিত্র তৈরির প্রশিক্ষণ হচ্ছে সালাহ (নামায)। অথচ সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে আজ সালাহকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সওয়াবের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে। যে সালাহ উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা উম্মাহ আজ হাজারো পথে বিভক্ত। কারণ সালাহর প্রকৃত রূপ হারিয়ে গেছে। ইসলামের প্রকৃত সালাহর রূপ জানতে প্রতিটি সত্যানুরাগী মানুষের বইটি পড়া জরুরি।

hezbuttawheed.org

যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩ । ০১৭১১০০৫০২৫ । ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫ । ০১৭৮২১৮৮২৩৭

রেনেসাঁর স্বপ্ন এখন সত্য হওয়ার পথে

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

বিশ্বপরিস্থিতি

আজকের এই সময়টির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, যদি কান পেতে শুনি, যদি আমাদের হৃদয়টি দিয়ে সময়টাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, যদি আমাদের চিন্তাশক্তি দিয়ে বিবেচনা করি তাহলে আমরা সম্যকভাবে জানতে পারব যে কী অবস্থায় আছি আমি নিজে এবং কী অবস্থায় আছে গোটা মানবজাতি। এই ঘোর অমানিশা, এই দুর্দশা দেখে সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ আজ দিশেহারা। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ষোলো হাজার এটমবোমা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মানুষ হত্যা করার জন্য। হিরোশিমা-নাগাসাকির সেই ক্ষত এখনও শুকায় নি। সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলো নিত্য নতুন ভয়াবহ সব মারণাস্ত্র তৈরি করে মহড়া দিচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত একে অপরকে নিকৃষ্ট ভাষায় হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, অস্ত্রের ভাষায় তারা কথা বলছে। সীমান্তে সীমান্তে চলছে সংঘর্ষ রক্তপাত। সামরিক বিশেষজ্ঞ, নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা যে কোনো মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা উদ্বেগের সঙ্গে প্রকাশ করছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানি, হানাহানি, স্বার্থের রাজনীতি সমস্ত দুনিয়াটাকে একটা নরক কুণ্ডে পরিণত করেছে। এ যেন দান্তের কল্পনার সেই 'ইনফার্নো'।

বাংলাদেশের ঝুঁকিটা কোথায়?

এই যে ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুনিয়াজুড়ে তা থেকে আমাদের এই দেশটিও বিচ্ছিন্ন নয়। এই বাংলার মাটিতে আমি জন্ম নিয়েছি। এ মাটিতে আমার পূর্ব পুরুষের অস্থিমজ্জা মিশে আছে। ১৯৭১ সালে এর পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের বীর জনতা দেশটাকে স্বাধীন করেছিল। সেই থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে চলল। আজকে আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে নিয়েও ভেতরে-বাইরে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চলছে। এখানে জঙ্গিবাদী তাণ্ডব সৃষ্টি করে, উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রদর্শনী ঘটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো নতুন একটি যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী পাঁয়তারা চলছে। সূত্র হচ্ছে এখানেও প্রায় ৯০% মানুষ ধর্মপরিচয়ে মুসলমান, আর বিশ্বজুড়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলামানদেরকে মানবতার শত্রু বলে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে এবং তাদের দেশগুলো একে একে নানা কায়দায় আগ্রাসন চালিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হচ্ছে, দখল করে নেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের দেশকে নিরাপদ রাখতে হলে আমাদের সকলকেই ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ কোথাও সরকার

দৈনিক বজ্রশক্তির চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। সেই বক্তব্যেরই সংক্ষিপ্ত রূপ এই লেখাটি।

একা তার দেশকে পশ্চিমা সামরিক আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে পেরেছে এমন নজির একটিও নেই। ষোলো কোটির এই জাতি যদি দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একতাবদ্ধ হয়ে যাবতীয় জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা ইত্যাদি অপশক্তিকে রুখে দেয় তাহলেই সম্ভব হবে দেশকে রক্ষা করা, কেননা সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয় অনৈক্য ও বিভাজনের সুযোগ নিয়েই সেখানে অনুপ্রবেশ করে থাকে।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই

এখন এই দেশের মানুষকে জাগ্রত করার জন্য, একাত্তরের মতো ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্ব প্রথম সোচ্চার হতে হবে আমাদের সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজকে। আমাদের দেশের সরকারগুলোও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এটা প্রমাণিত সত্য যে, শুধু শক্তি প্রয়োগ করে মতবাদগত সন্ত্রাস কখনও নির্মূল করা যায় না। একটি অন্যায়, অবিচারপূর্ণ সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যুগে যুগে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে, কেউ তাদের সন্ত্রাসের পক্ষে ধর্মকে আশ্রয় করেছে, কেউ জাতীয়তাবাদকে, কেউ সাম্যবাদকে। আমরা ২০০৯ সন থেকে সরকারের প্রতি প্রস্তাবনা পেশ করে আসছি,

বজ্রশক্তি পত্রিকার মাধ্যমে, জনসভা-সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে বলে আসছি যে জঙ্গিবাদীরা যে আদর্শ বা আইডিওলজি মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তাদেরকে প্রভাবিত করছে আমাদের উচিত সেই আদর্শের ত্রুটিগুলো মানুষের সামনে যুক্তি প্রমাণ ও ধর্মীয় রেফারেন্স দিয়ে (Counter Narrative) সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যেন মানুষের ধর্মীয় চেতনা ভুল পথে, মানবতাবিধ্বংসী পথে পরিচালিত না হয়। সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে ট্যাকটিক্যাল ওয়ার বা কৌশলগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাশাপাশি আইডিওলজিক্যাল ওয়ার বা আদর্শিক লড়াইও অপরিহার্য। কেননা ধর্মীয় চেতনার অপব্যবহার এমনই একটি বিষয় যা কেবল বুলেট বোমা দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আমাদের দৈনিক বজ্রশক্তির মূল কাজ এই ধর্মীয় চেতনার অপপ্রয়োগ, ধর্মের উদ্দেশ্যমূলক অপব্যাখ্যার বিপরীতে ধর্মের প্রকৃত আদর্শ তুলে ধরা যার মাধ্যমে এই সকল বিষবৃক্ষকে শেকড়সুদ্ধ মানুষের মগজ ও হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলা, পাশাপাশি যে ধর্ম মানুষকে উন্নত জীবে পরিণত করে, প্রগতিশীল করে, ভারসাম্য দেয়, ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আত্মিক প্রেরণা দান করে সেই শিক্ষাগুলোকে মানুষের সামনে মেলে ধরা।

কখন রেনেসাঁর প্রয়োজন হয়

যখন কোনো সমাজ অচলায়তনে পরিণত হয়, প্রথাগুলো প্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতা প্রবল শক্তিমান হয়ে ওঠে, অযৌক্তিক বিজ্ঞানহীন চিন্তাচেতনায় মাকড়শার জালে বন্দী পতঙ্গের ন্যায় সমাজ ছটফট করতে থাকে তখন সেই জালকে ছিন্ন করতে আবির্ভূত হন কিছু দৃষ্টিবান মানুষ যারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য। তারা ইতিহাসের গতিপথকে পাল্টে দেন। তাদের এই সম্মিলিত জাগরণকে বলা হয় রেনেসাঁ। মানবজাতি বার বার এই রেনেসাঁর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। মানবসভ্যতার চিন্তাজগতে সাম্প্রতিকতম রেনেসাঁটি হয়েছিল ইউরোপে।

প্রকৃত ইসলাম এমন ছিল না

আজকে যারা ধর্মের নামে বিভিন্ন প্রকার উন্মাদনা সৃষ্টি করছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাচ্ছে, অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড করছে, মানুষের জ্ঞানসাধনায়, মুক্তচিন্তায় ও বাকস্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সহাবস্থানের পরিবেশ বিনষ্ট করছে, জঙ্গিবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে তাদের জ্ঞাতার্থে একটি কথা বলতে হয়- চৌদ্দশত বছর আগে আল্লাহ যে ইসলামটি পাঠিয়েছিলেন সেই ইসলাম কিন্তু কোনো জ্ঞানবিমুখ, অজ্ঞতাপূজারী, উন্মাদনাপ্রবণ বর্বর জাতি সৃষ্টি করে নি, বরং এমন একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল যার কাছে আধুনিক যুগ এমন কি ইউরোপে সংঘটিত রেনেসাঁও ঋণ স্বীকার করে থাকে।

'ইকরা' মানে জানো

পবিত্র কোর'আনে অবতীর্ণ প্রথম শব্দটিই হলো একটি আদেশ- ইক্‌রা। অর্থাৎ পড়ো, জানো। সেই অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবদেরকে বলা হচ্ছে জানতে, বলা হচ্ছে চিন্তা করতে, গবেষণা করতে, অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাদের মস্তিষ্ককে ব্যবহার করতে তাগিদ করা হচ্ছে। আল্লাহর রসুল তাদের চিন্তাজগতে জাগরণ, রেনেসাঁ সৃষ্টি করে দিলেন। তার ফলাফল তো ইতিহাস, সকলেই জানেন। তারা যখন জানল, বুঝল, পড়ল, শিখল তখন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সামরিক শক্তিতে পৃথিবীর সকল জাতির শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল, সকলের শিক্ষকের আসন অধিকার করেছিল, হয়েছি প্রধান পরাশক্তিধর সভ্যতা। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, শিল্পে, সাহিত্যে রেনেসাঁ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই রেনেসাঁর ঢেউ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে রেনেসাঁ

মধ্যযুগের ইউরোপেও দীর্ঘকাল থেকে চলছিল দাসপ্রথা, সামন্তপ্রভুদের দুঃশাসন আর খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ফতোয়ার তরবারিতে নির্দোষ মানুষের রক্তসাগর বয়ে গিয়েছিল। একদিকে বিপুল ভোগ বিলাস আর ক্ষমতার চাবুক, অপরদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য আর বঞ্চনা। যারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কথা বলতেন, যারা চিন্তাশীল, বিজ্ঞানী, সংস্কারপন্থী দার্শনিক ছিলেন তাদেরকে ধর্ম-অবমাননার অভিযোগে পুড়িয়ে মারা হতো। এই সময়কেই বলা হয় ডার্ক এইজ বা অন্ধকারের যুগ, জাহেলিয়াতের যুগ। তখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর রাজতন্ত্রের যাঁতাকলের নিষ্পেষণ থেকে অসহায় মানবতাকে পরিত্রাণ করতে ইউরোপের সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করতে লাগলেন, নাট্যকাররা নাটক লিখতে লাগলেন, কবিরা কবিতা লিখলেন, শিল্পিরা ছবি আঁকলেন। তাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষের চিন্তার বন্ধঘরের তালা খুলে গেল, নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচিত হলো। সাংঘাতিক এক রেনেসাঁর সৃষ্টি হল। সেই সকল রেনেসাঁর ফলেই আজকে আমরা মানবজাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত এই উন্নতির যুগে উপনীত হয়েছে।

অপশক্তির হাতে বন্দী বিজ্ঞান ও মানবতা

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে জ্ঞানের ভারসাম্যহীনতার ফলে, ন্যায়-নীতির ভুল মানদণ্ডকে ধারণ করার কারণে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও মানুষকে এখনও তাদের বাস্তবজীবনে চরম অন্যায়-অবিচার, খুন-ধর্ষণ, নিরাপত্তাহীনতা, দুঃখ-ক্লেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাতের মধ্যেই বাস করতে

হচ্ছে। যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছিল আশীর্বাদ সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই আজ অপশক্তির কুক্ষিগত হওয়ার কারণে মানবতার বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানবজাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত করেছে, ফেলে দিয়েছে অস্তিত্বের সংকটে। আজও চলছে শক্তিমানের শাসন, পুরো মানবজাতি ন্যায়-অন্যায় ভুলে পারমাণবিক শক্তির সামনে, তাদের যাবতীয় অন্যায়ের সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে। গ্রাম থেকে শুরু করে বিশ্ব সর্বত্র এখন সরলের উপর ধূর্তের প্রতারণা, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, শাসিতের উপর শাসকের জুলুম। নিরপরাধ শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা। যেন সেই অন্ধকার যুগ, ডার্ক এইজের প্রেতাত্মা এই সময়ের কাঁধে ভর করেছে।

ধর্ম কেন আবেদন হারালো?

এ যুগের ধর্মান্ধ, কূপমণ্ডুকদের বুঝতে হবে তাদের ধারণ করে রাখা অযৌক্তিক, পরকালনির্ভর, সওয়াবনির্ভর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পূর্ণ, বিজ্ঞানবিদ্বেষী, প্রগতিবিমুখ, জবরদস্তিকর, পুরুষতান্ত্রিক ও নারী নিগ্রহকারী ধ্যান-ধারণা আর মানবজাতির কাছে গৃহীত হবে না। সেটা বহু শত বছর আগেই আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। কখন আবেদন হারিয়েছে সেটাও সকলের জানার প্রয়োজন আছে। যখন মানবজাতি দুর্ভোগে নিমজ্জিত হয়েছিল, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকায় চলছিল দাসত্ব ব্যবস্থার নিষ্পেষণ, ইউরোপে চলছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও ইনকুইজিশান, রাশিয়ায় চলছিল জারতন্ত্রের দুঃশাসন তখন ধর্মগুলো কী করছিল? মুসলিমরা কী করছিল? তারা তো সেই অন্যায় অবিচারের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে ছুটে যায় নি। তাদের কাছে সেই মহান আদর্শ ছিল যা দিয়ে তারা তখন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছিল। কিন্তু তাদের শাসকরা ছিল ভোগবিলাসে নিমগ্ন, তাদের আলেমরা ছিল ফেকাহ আর তাফসির নিয়ে ফতোয়াবাজির গবেষণায় নিবিষ্ট, তাদের সুফিবাদীরা ছিলেন আরো উত্তম পরহেজগার বান্দা হওয়ার সাধনায় আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। ধার্মিকরা নিজেদেরকে মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা আর খানকার চার দেওয়ালে বন্দী করে রেখেছিল, সেখানে বসে বসে তসবিহ টিপছিল। তারা একটিবার মাথা তুলে করে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখ নি। তারা মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, সামাজিক মুক্তির, সামগ্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য কেন ছুটে যায় নি? অথচ মানুষ মুক্তির নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিল, তারা বিক্ষিপ্তভাবে জীবন দিয়ে যাচ্ছিল মুক্তির সংগ্রামে।

যারা মানুষকে রক্ষা করতে গিয়েছিল তারাই কার্যত অবতার

এসময় তাদের জন্য এগিয়ে এসেছেন ডেকার্ট, স্পিনোজা, আব্রাহাম লিঙ্কন, কার্ল মার্কস, লেনিন, চে গুয়েভারা। তারা মানুষকে সংগঠিত করেছেন, তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছেন বিপ্লবের মন্ত্রে। বক্তব্য দিয়েছেন, মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, সেই পথের মধ্যে ভ্রান্তি থাকতে পারে যা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেটা অন্য জিনিস। তাদের উদ্দেশ্য তো সঠিক ছিল, মানুষ একটি বিকল্প খুঁজছিল, সেটা তারা পেয়ে গিয়েছিল ঐ দার্শনিক ও বিপ্লবীদের কাছে। সময় তো আর থেমে থাকে না। ধর্ম যখন মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে পারল না তখন ঐ নতুন নতুন দর্শনগুলোকেই মানুষ আলিঙ্গন করে নিল, সাম্যবাদ, গণতন্ত্রকেই তারা গ্রহণ করে নিল। তারা সাড়ে ছয় হাজার মাইল দুর্গম পথ মাও সেতুং- এর সাথে পাড়ি দিল, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব ঘটালো। বর্ণবাদ বিলোপের পর নিগৃহীত কালো মানুষেরা আব্রাহাম লিংকনকেই দেবতা হিসাবে গ্রহণ করে নিল। সেই দিনই ধর্ম মানুষের কাছে আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। এখন ধর্ম ব্যক্তিগত উপাসনালয়ের জন্য, পরকালের জন্য। সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্মগুলো এখন উপাসনালয়ের গণ্ডিতে কোনোমতে টিকে আছে। সেখান থেকেই বিস্তার করে যাচ্ছে বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। সুতরাং সেটাও টিকে থাকতে পারবে না বেশিদিন। কারণ চূড়ান্ত বিচারে মানুষ যুক্তিশীল প্রাণী, তারা সাময়িক হুজুগে চালিত হলেও সেটা স্থায়ী হতে পারে না। যুক্তির বাহিরে মানুষ কোনো কাজ বেশি দিন করে না। প্রকৃত ইসলাম এই জন্য যুক্তির কথা বলে, আর বর্তমানের বিকৃত ইসলাম এই যুক্তির বিরুদ্ধে কট্টর অবস্থান নিয়েছে।

এখন কারা রেনেসাঁ ঘটাবে?

এ পরিস্থিতিতে আবারো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে একটা মানবিক সভ্যতার অভ্যুত্থানের যেখানে শক্তির রাজত্ব থাকবে না, থাকবে সত্যের রাজত্ব, ন্যায়ের রাজত্ব। যেখানে মানুষ কথা বলতে পারবে মুক্তভাবে, ভাবতে পারবে মুক্তভাবে। প্রতিটি মানুষ অবাধে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে পারবে, যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারবে। অধিকারের জন্য কাউকে আর রক্ত দিতে হবে না। এখন এই অচলায়তনকে প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে ফেলা সাধারণ মানুষের কাজ নয়, এটা হচ্ছে এ যুগের সকল শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের কাজ। তারাই সাধারণ মানুষের চিন্তার দুয়ারে এই বজ্রাঘাতটি করবেন যেন তারা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এই কাজটি করার জন্য যে আদর্শটি প্রয়োজন তা আমাদের কাছে আছে। বলতে পারেন আল্লাহ দান করেছেন, বলতে পারেন আমরাই সেটা উপলব্ধি করেছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমরা সেই আদর্শ নিয়ে মাঠে নেমেছি। দৈনিক বজ্রশক্তি সেই আদর্শটিই মানুষের সামনে তুলে ধরছে।

মৌসুমী বাতাসের মতো জনতার 'মন' দিক পাল্টায়!

মসীহ উর রহমান

আমি যদিও রাজনীতি করি না কিন্তু বাংলাদেশের জনগণকে নিয়েই তো কাজ করি, তাই এদেশের মানুষের মনস্তত্ত্ব আমাকে মাঝে মধ্যে ভাবিয়ে তোলে। গতকালকে সরকারের প্রতি বিএনপি চেয়ার পারসন খালেদা জিয়ার আহ্বান ছিল এমন যে, "নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে দেখুন মানুষ কী চায় (প্রথমআলো)।"

তিনি খুবই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন যে, মানুষ আসলে বিএনপি-কেই চায়। অভিযোগ রয়েছে পরিবহন বন্ধ করে দিয়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সমাবেশস্থলে হাজার হাজার মানুষকে আসতে দেওয়া হয় নি, তথাপি জনসভা যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। বোঝা গেল, যদি সবকিছু স্বাভাবিক থাকতো তাহলে গোটা রাজধানী লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। একই রকম দৃশ্য দেখেছিলাম বারো বছর আগে। যখন বিএনপির শাসনামলে সন্ত্রাস, লুটপাট, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। শেখ হাসিনার জনসভা মানেই জনসমুদ্র, তখন তিনিও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতেন যে, জনগণ কী চায়, মানে আওয়ামী লীগকেই চায়। সত্যিই তাই হলো, নির্বাচনে তিনি ভীষণভাবে বিজয়ী হলেন। যে লোকটা কোনোদিন ইউপি চেয়ারম্যান হবে কিনা সন্দেহ সেও নৌকা প্রতীক নিয়ে এমপি হয়ে গেল। সংসদে নৌকা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল, আর অন্যদিকে বলা চলে বিএনপির ভরাডুবি হলো।

সে সময়ে বিএনপির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর সবই এখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আনা হচ্ছে। তাহলে জনগণ আসলে কী চায় আমি বুঝলাম না। তারা কি মৌলিক কোনো পরিবর্তন চায়? নাকি তারা উপায়ন্তর না পেয়ে কড়াই থেকে চুল্লি-তে, আবার চুল্লি থেকে কড়াইতে আসা-যাওয়া করছে? নাকি আসলে জনগণ কোনো ফ্যাক্টরই না, যারা রাজনীতির ব্যবসা করছেন তারাই জনগণের নাকে রশি বেঁধে এভাবে গরুর মতো ঘোরাচ্ছেন? ভাবে মনে হয়, জনগণের সামনে অপশন মাত্র দুইটা- হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরবে নয় বিষ খেয়ে মরবে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গেল নির্বাচনের সময় ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে মার্কিন জনগণ এমন একজন মাস্তান প্রেসিডেন্ট চাচ্ছিল যিনি অন্যান্য সকল পরাশক্তির দাপটকে দমন করে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বকে অক্ষুন্ন রাখবেন। এ কারণে অনেকেই হিলারিকে সমর্থন করে নি। ভাবা হয়েছিল নারীরা হিলারিকে সমর্থন দেবেন, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অধিকাংশ নারী ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছে।

একইভাবে ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানি ভারতের জনগণের মনস্তত্ত্ব নিয়েও বেশ আলোচনা আমরা দেখতে পেয়েছি। ভারতের জনগণের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় চেতনায় জাগ্রত রাষ্ট্র চায় এবং উপমহাদেশে নয় কেবল, বিশ্বের বুকেও ভারতের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়। এ কারণেই তারা শত বছরের ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসকে জরাজীর্ণ, দুর্নীতিগ্রস্ত হিসাবে চিহ্নিত করে বহু অঘটনঘটনপটিয়সী হিন্দুত্ববাদী মোদিকে বিপুল সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় আনেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জার্মান জাতির উচ্চাভিলাস ও মনস্তত্ত্ব এমনভাবে কাজ করেছিল যে তারা হিটলারের নেতৃত্বের অধীনে সারা দুনিয়াকে ধরাশায়ী করবে। হিটলার ভালো কি মন্দ সেই বিবেচনার বোধও তারা হারিয়ে ফেলেছিল। যুদ্ধের একটা পর্যায়ে কে জার্মানির শত্রু আর কে মিত্র সেই হিতাহিত জ্ঞানটাও তাদের হারিয়ে গিয়েছিল। যার ফলে জার্মান সেনারা মিত্র দেশ রাশিয়ার লেলিনগ্রাদ আক্রমণ করে বসেছিল, এবং বৈরী আবহাওয়ায় ধরাশায়ী হয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাস সবারই জানা- লজ্জাজনক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতি ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কাজেই জাতির মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কিন্তু এখন বাংলাদেশের জনগণের মনস্তত্ত্ব আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। এদেশে যেভাবে মৌসুমী বায়ু উত্তর দিকে যায়, আবার উত্তরের হিমশীতল বায়ু দক্ষিণ দিয়ে যায়- এই বায়ু প্রবাহ বাংলার মানুষের মনস্তত্ত্বের উপরও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। যেভাবে তারা কিছুদিন যেতে না যেতেই অতীতকে বেমালুম ভুলে যায় সেটা তাদেরকে স্মৃতিভ্রংশ বা অ্যামনেশিয়া রোগী বলেও ভ্রম সৃষ্টি হয়। ইতিবাচক পরিবর্তন চাওয়া অবশ্যই উত্তম, গতিশীলতাই প্রাণ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কীসের পরিবর্তন ঘটিয়ে কী আনব, সেটা কেন আনব তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পরিণতি কী হবে সেটা বিবেচনা করাই মানসিক সুস্থতার পরিচয় নয় কি? আমি যখন দেখব যে, যিনিই লঙ্কায় যাচ্ছেন তিনিই রাবন বনে যাচ্ছেন তখন আমাকে ভাবতে ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে। কিন্তু আমাদের জনগণ সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন না করে সরকার পরিবর্তনকেই রাজনীতির লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে যা কস্মিনকালেও তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত অর্জন এনে দিতে পারবে না।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা:

শুধু শক্তি প্রয়োগ করে সম্ভব নয়

মোহাম্মদ আসাদ আলী

সন্ত্রাসের অর্থ ও সংজ্ঞা:

সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ নির্মূল প্রসঙ্গে মূল বক্তব্যে যাবার আগে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অর্থ ও সংজ্ঞা জেনে নেওয়া আবশ্যক। সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ হতে উদ্ভূত, যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা। (ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ. ৫৭৩)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে, 'সন্ত্রাসবাদের কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সরকার ও বে-সরকারী উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে এই শব্দ প্রয়োগ করে। ডানপন্থী, বামপন্থী, জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয়, বিপ্লবী ও ক্ষমতাসীন দল সকলেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ করা হয়।' (Encyclopedia Britannica. p. 3. Retrieved 2015-01-07)।

'ইউ এস কোড অব ফেডারেল রেগুলেশানস' সন্ত্রাসবাদের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো- 'যে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে সরকার, জনগণ বা কোনো গোষ্ঠীর উপর অবৈধভাবে শক্তি প্রয়োগ করা বা তাদের সম্পদের উপর হামলা করে ভীতি সৃষ্টি করা।' (The unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.'

এছাড়া ২০০৯ সালে প্রণীত আমাদের দেশীয় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, ''কেহ বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোনো অংশের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে- (ক) কোনো ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করিলে, বা কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিলে; অথবা (খ) দফা 'ক' এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য বস্তু, আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিলে বা নিজ দখলে রাখলে তিনি সন্ত্রাসী কার্য সংগঠনের অপরাধ করিবেন।''

সন্ত্রাসের যে অর্থ ও সংজ্ঞা আমরা পেলাম, এর কোথাও কি নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম, বর্ণ, দল, মতাদর্শের নাম রয়েছে? কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম-বর্ণের মানুষ এই কাজগুলো করলে সে সন্ত্রাসী বিবেচিত হবে, কিন্তু অন্যরা করলে সন্ত্রাসী হবে না এমন কোনো সুযোগ থাকল কি? তারপরও সন্ত্রাসবাদ শব্দটির সাথে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে জড়িত করে দেওয়ার প্রবণতা (Tendency) লক্ষ্য করা যায়, যদিও সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামের দূরতম সংযোগও কোনোকালে ছিল না এটা ইতিহাস। বরং ইসলামে সন্ত্রাসবাদের শাস্তি কত কঠোর তা নিচে তুলে ধরা হলো।

ইসলামে সন্ত্রাসের শাস্তি সবচাইতে কঠোর:

পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটা তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের মহাশাস্তি রয়েছে।" (আল-কুরআন, ৫: ৩৩)

কোন মুসলিমকে আতঙ্কিত করা অবৈধ। রসুল (সা.) বলেন, "কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।" (ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ: মাই ইয়াখুযুশ শাইআ 'আলাল মিযাহি, বৈরূত: দারুল কিতাব আল- আরাবিয়্যা, তা.বি.খ. ৪, পৃ. ৪৫৮)

কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারী ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সদস্য নয়। এ মর্মে রাসূল সা: বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (ইমাম বুখারী, সহীহ আল- বুখারী, অধ্যায়: আদ- দিয়াত, অনুচ্ছেদ: কওলুল্লাহি তা'আলা ওয়া মান আহইয়াহা/আল-মায়িদাহ- ৩২, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫২০) কোনো

মুসলিমকে অস্ত্র দ্বারা হুমকি দেয়া নিষিদ্ধ। রসুল (সা.) বলেন, "তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা হুমকি না দেয়। কেননা হতে পারে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান তার হস্তদ্বয় আঘাত হানার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটবে; অতঃপর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"। (ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ: কওলুন্নাবিয়্যি স. মান হামালা আলান্নাস সিলাহা ফা লাইসা মিন্না, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫৯২)

কোন মুসলিমকে হত্যা করা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার থেকেও গুরুতর। রসুল (সা.) বলেন, "আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর হচ্ছে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা।" (ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায়: আদ-দিয়াত আন রাসূল সা: অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফি তাশদিদি কতলিল ম'মিননি, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ৪২৬)

সন্ত্রাসবাদের জন্ম ইউরোপে:

প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ঘাঁটলে ইউরোপের দিকেই অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করতে হয়। নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও অক্সফোর্ড ডিকশনারি অব ইংলিশ' এ বলা হচ্ছে- '১৮ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবের সময়ে টেররিস্ট ও টেররিজম শব্দদ্বয় সৃষ্টি হয়েছে। তবে রোনাল্ড রিগানের শাসনামলে ১৯৮৩ এর বৈরুত ব্যারাক বোমা হামলা, ২০০১ এর নিউ ইউর্ক ও ওয়াশিংটনে হামলা ও ২০০২ এ বালি হামলার পর এ শব্দদুটোর ব্যাপক প্রসার শুরু হয়। (The terms "terrorist" and "terrorism" originated during the French Revolution of the late 18th century but gained mainstream popularity during the U.S. Presidency of Ronald Reagan (1981–89) after the 1983 Beirut barracks bombings and again after the attacks on New York City and Washington, D.C. in September 2001and on Bali in October 2002.)

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদ মুসলিমদের নয় পশ্চিমাদেরই একটি ঐতিহাসিক কালো অধ্যায়ের নাম। পরবর্তীতে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু হলে ইসলাম ও মুসলিম জাতির উপর সন্ত্রাসবাদের তকমা বিশেষভাবে লেপে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই যে মুসলিমদেরকে বিশ্বের বুকে খাটো করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদের তকমা চাপিয়ে দেওয়া এবং অন্যান্য সকল ধর্ম, বর্ণ, দল, মতাদর্শের মানুষ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলেও সেগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে কেবল মুসলিমদেরকেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি ইত্যাদি বলে অভিহিত করে প্রচারণা চালানোর প্রবণতা- এর বিরুদ্ধে নৈতিক অবস্থান যদি আমরা নিতে না পারি তাহলে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে সফলতা আসবে না। উপরোক্ত সংজ্ঞা মোতাবেক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যারাই করবে, যারাই সমাজে আতঙ্ক বিস্তার করবে, মানুষের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি করবে তাদেরকেই সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও সকলকে সমভাবে সোচ্চার থাকতে হবে। কেবল ইসলামের নামে করা হলে সোচ্চার থাকব, কিন্তু গণতন্ত্রের নামে বা সমাজতন্ত্রের নামে বা অন্য কোনো ধর্মীয় মতাদর্শের নামে আতঙ্ক বিস্তার করা হলে তাদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি বলব না, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হব না তা হতে পারে না। যদি তেমনটা করি তাহলে আমাদের নৈতিক শক্তি থাকবে না সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার। তাছাড়া এমনটা হলে বৃহত্তর মুসলিম জনসাধারণও সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে কোনো উদ্যোগকে সহজভাবে গ্রহণ করবে না। তারা এটাকে দেখবে ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অন্যান্য জাতিগুলোর ষড়যন্ত্র হিসেবে, তাদের উপর নিপীড়নের ইস্যু হিসেবে। এক সময় জনগণের মধ্যে এর আবেদন হারিয়ে যাবে এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ বলে- বর্তমানে তেমনটাই হয়েছে। কাজেই সত্যিকার অর্থেই জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে হলে প্রথমত সরকারসহ সংশ্লিষ্টদেরকে শক্ত নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে, যাবতীয় অন্যায়কে অন্যায় বলতে হবে, যাবতীয় সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস বলতে হবে, দ্বিতীয়ত জঙ্গিবাদ নির্মূলে কার্যকরী উপায় অন্বেষণ করতে হবে।

শুধু শক্তি প্রয়োগে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শক্তি প্রয়োগের পন্থায় জঙ্গিবাদ নির্মূলের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও এই পন্থাকেই মূলত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে বড়জোর জঙ্গিদেরকে সাময়িকভাবে কোনঠাসা করে রাখা গেলেও পুরোপুরি নির্মূল করে ফেলা সম্ভব নয়। এর কারণ হিসেবে আমরা দুইটি বিষয় খুঁজে পাই।

প্রথম কারণ- জঙ্গিবাদ আদর্শিক বিষয়। যারা জঙ্গি হচ্ছে তারা একটি ভ্রান্ত আদর্শকে সঠিক মনে করে সেটা প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে তাদের ধর্মীয় আবেগ ও ঈমান জড়িত। তারা যা করছে পার্থিব লাভের আশায় করছে না, পরকালীন প্রতিদানের আশায় করছে, যদিও ভুল পথে গন্তব্যে পৌঁছা যায় না। এমতাবস্থায় শুধু শক্তি প্রয়োগ করলে একে ঈমানী পরীক্ষা মনে করায় তাদের ঈমান আরো বলিষ্ঠ হচ্ছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সেই চেতনা প্রবাহিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় কারণ- জঙ্গিবাদের স্রষ্টা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো। তারা জঙ্গিবাদের ইস্যুকে জিঁইয়ে রেখে বিশ্বময় নিজেদের একাধিপত্য

প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এজন্য মানবতার যতই বিপর্যয় ঘটুক না কেন, সেটা এই দানবিক পরাশক্তিগুলোর জন্য কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। তাদের চাই তেল, গ্যাস, আধিপত্য, অস্ত্রব্যবসার জমজমাট বাজার এবং শক্তিশালী প্রভাব বলয় (Predominance)। এই পরাশক্তিগুলোকে অনুসরণ করে যদি শুধুমাত্র বল প্রয়োগে জঙ্গিবাদ দমনের বা নির্মূলের চেষ্টা চালানো হয়, সেটা কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনবে না।

কাজেই আমাদের নিজেদের স্বার্থে জঙ্গিবাদকে কার্যকর পদ্ধতি দ্বারা মোকাবেলা করা উচিত। সেই সঠিক পদ্ধতির কথা আমরা বরাবরই বলে আসছি। সঠিক আদর্শ দিয়ে ভ্রান্ত আদর্শ জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করতে হবে। যারা জঙ্গিবাদের পক্ষে প্রচার প্রচারণা চালায়, তারা কোর'আন হাদিস, ইতিহাস ইত্যাদি থেকে নানা যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরে মানুষকে জঙ্গি হতে প্ররোচিত করে। তাদের সেই অপব্যাখ্যাকে যদি ভ্রান্ত হিসাবে প্রমাণ করা যায় তাহলে অবশ্যই কেউ আর জঙ্গিবাদের দিকে যাবে না এবং ইতোমধ্যেই যারা সে পথে পা বাড়িয়েছে তারাও যদি বুঝতে পারে যে, এ পথ তাদের দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ধ্বংস করছে তাহলে তারাও সংশোধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রয়োজন পাল্টা আদর্শঃ

এ কথা এখন অনেকেই বলছেন, জঙ্গিবাদ একটি আদর্শ তাই একে মোকাবেলা করতে পাল্টা আদর্শ (Counter Narratives) লাগবে এবং সেটাকে ধর্মীয় আদর্শ হতে হবে। আমাদের দেশের সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ.ল.ম ফজলুর রহমানও জঙ্গিবাদ মোকাবেলা সম্পর্কে এই একই যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "রাজনীতিকে যেমন রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে, ইসলামের মধ্যে যারা জঙ্গিবাদ নিয়ে আসছে তাদেরকে কোর'আন-হাদিস দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। সেক্যুলারিজম দিয়ে মোকাবেলা করে আপনি পারবেন না। কারণ তারা সেক্যুলারিজমকে একটি চ্যালেঞ্জিং পার্টি মনে করে অর্থাৎ হয় তারা জিতবে আপনি হারবেন অথবা আপনি হারবেন তারা জিতবে। এভাবে এটাকে আপনি মোকাবেলা করতে পারবেন না।" (চ্যানেল আই-তৃতীয় মাত্রা, ১৯ অক্টোবর ২০১৫)। একইভাবে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেন, ''জঙ্গিরা বা সন্ত্রাসবাদীরা যেহেতু ডগমা বেইজড বা আইডিওলজি বেজড, তো এটাকে মোকাবেলা করতে গেলে ট্যাক্টিক্যালি শুধু গ্রেফতার কিংবা জেলে ভরে সাজা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একে মোকাবেলা করা কঠিন। একটা স্ট্র্যাটেজি থাকা দরকার, যে স্ট্র্যাটেজির কমপোনেন্ট থাকবে একটা কাউন্টার র‍্যাডিকেলাইজেশন, যেটা প্রিভেনশনের কাজ করবে যেন নতুন করে র‍্যাডিকেলাইজড না হতে পারে, বা যারা ইতোমধ্যেই র‍্যাডিকেলাইজড হয়েছে কিন্তু সরাসরি টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিস এ অংশগ্রহণ করে নি, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা। **সেটা কাউন্টার ন্যারেটিভস প্রদানের মাধ্যমে তাদের ন্যারেটিভটাকে মোকাবেলা করে ফিরিয়ে আনার কাজ,** যেটা আসলে সরাসরি ল' অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্টের কাজ নয়।" (২২ জানুয়ারি, ২০১৭, টকশো- 'মুখোমুখী', চ্যানেল ২৪)

এভাবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াইয়ের কথা এখন সবাই বলছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, 'জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে।' আল্লাহর অসীম করুণা এই যে, আমরা ইসলামের সেই প্রকৃত শিক্ষা জেনেছি এবং সেই দায়বদ্ধতা থেকেই সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে চলেছি। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না- এই কাজ আমাদের একার নয়। এই কাজ সরকার, রাজনৈতিক দল, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, আলেম-ওলামা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকের। এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি সবাইকে ঈমানী চেতনা ও সামাজিক দায়িত্ব মনে করে এগিয়ে আসতে হবে। কে কোন দলের, কে কোন মতের, কে কোন আদর্শের তা দেখা চলবে না। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দল-মতের ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠে সকলকেই ঐক্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং শপথ নিতে হবে- আমরা থাকব যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

আজকে শিক্ষার আলো বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের কথা বাদ দিলেও, শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যেও ধর্মের প্রশ্নে অস্পষ্টতা কাজ করতে দেখা যায়। এই অস্পষ্টতা রাখা যাবে না। আমাদেরকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, কোনটা প্রকৃত ইসলাম আর কোনটা বিকৃত ইসলাম, কোনটা হক্ব কোনটা বাতিল। পৃথিবীময় ইসলামের নামে হাজারো মত-পথ চালু করে দেওয়া হয়েছে। কেউ ইসলামের নামে ধান্দাবাজির রাজনীতি করছে, কেউ অর্থোপার্জন করছে, কেউ সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আবার ইসলামের নামেই একদল মানুষ দুনিয়াবিমুখ হয়ে হুজরা-খানকায় আধ্যাত্মিক সাধনা করছে। একেক ফেরকা-মাজহাবের কাছে ইসলাম হলো একেক রকম। ইসলামের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা কোথাও নেই। কিন্তু ইতিহাস বলে, আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম এমন ছিল না। সেই ইসলাম সবার কাছেই এক রকম ছিল। কোনো ফেরকা-মাজহাব ছিল না, এত মত-পথের বালাই ছিল না, যে কোনো প্রশ্নে জাতি থাকত ঐক্যবদ্ধ। সেই প্রকৃত ইসলামকে তার অনাবীল রূপে জাতির সামনে তুলে ধরতে পারলে ধর্মকে ব্যবহার করে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল জাতিবিনাশী নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে পারবে না এবং এই মুহূর্তে জঙ্গিবাদের মত জাতিবিনাশী সংক্রমণের হাত থেকে মুক্তি পাবার এটাই সবচাইতে কার্যকরী সমাধান। তাই আমাদের পথচলা সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই।

দিশাহারা মুসলিম জাতির এখন কী করণীয়?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে মুসলমান নামক জাতিকে গভীরভাবে ভাবতে হবে যে, আমাদের ইতিহাস কী? আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেমন করে আমাদের জন্ম হয়েছে, কেন আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, আমাদের লক্ষ্য কী ছিল, কী উদ্দেশ্যে আমাদের একটি জাতি হিসেবে গঠন করা হয়েছে? আজকের এই প্রায় ১৬০ কোটির এ জাতির মনে এই প্রশ্নগুলি জাগে না। কেউ এই প্রশ্নগুলি করলে একশ' ষাট কোটির কাছ থেকে অন্তত দশকোটি রকমের বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়। চৌদ্দশ' বছর আগে যখন এই জাতিটির জন্ম হয়েছিল, আল্লাহর শেষ রসুল (সা.) তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা, অতুলনীয় ত্যাগ, অবিচল নিষ্ঠা, অটল অধ্যবসায় এবং অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের মাধ্যমে এই জাতিটিকে গঠন করেছিলেন তখন কিন্তু ঐ জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে উপরোক্ত ঐ প্রশ্নগুলি করলে সবাই একই উত্তর দিতেন, কোনো মতভেদ ছিল না।

সংক্ষেপে ঐ জাতির ইতিহাস হচ্ছে এই যে, জাতিটি গঠিত হবার মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর দুইটি পরাশক্তিকে পরাজিত করে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় ন্যায়, সুবিচার, সাম্য, মানবতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঐ মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দুইটি ছিল রোমান ও পারসিক। সংখ্যায়, সম্পদে, সামরিক বাহিনীর সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, এক কথায় সব দিক দিয়ে ঐ দুইটি বিশ্বশক্তি ছিল ঐ শিশু জাতির চেয়ে বহুগুণে বড়। কিন্তু তবুও তারা ওই নবগঠিত ছোট্ট জাতির সামনে দাঁড়াতে পারে নি। তারপর ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ঐ জাতিটি তখনকার দিনের অর্ধেক পৃথিবী জয় করে একই রকমের শান্তি প্রতিষ্ঠা করল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে, চিন্তা-চেতনায় শিক্ষকের আসনে আসীন হলো। এই পর্যন্ত ঐ জাতির ইতিহাস তাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের ইতিহাস।

উম্মতে মোহাম্মদীর এই সংগ্রাম কিসের লক্ষ্যে?

ঐ বিজয়ের উদ্দেশ্য কী ছিল? সাম্রাজ্য? নাকি অন্য ধর্মের লোকজনকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা? না, এর কোনোটাই নয়। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ছিল ঠিক তাই যে উদ্দেশ্য, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহর নির্দেশে তাঁর শেষ রসুল এই জাতিটিকে, এই উম্মাহটি গঠন করেছিলেন। আর তা হলো, সমস্ত পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরী করে মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, অত্যাচার নিঃশেষ করে দিয়ে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর এই জন্যই এই দীনের নাম ইসলাম, আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত ঐ একই নাম, ইসলাম বা শান্তি। আজ আমাদের ধর্মীয় ও অধর্মীয় (অর্থাৎ রাজনৈতিক) নেতারা যে অর্থে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলেন তার ঠিক বিপরীত অর্থ। উম্মতে মোহাম্মদী মানুষের জাতীয় জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংগ্রামের মাধ্যমে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তারা তার ধর্ম ত্যাগ করে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেননি। অর্ধেক পৃথিবীতে দীনুল হক প্রতিষ্ঠার ফলে ঐ সমস্ত এলাকায় লুপ্ত হয়ে গেল শোষণ, অবিচার, অন্যায়, নিরাপত্তাহীনতা অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা। প্রতিষ্ঠিত হলো ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সুবিচার ও নিরাপত্তা; এক কথায় শান্তি। ভেদাভেদ ভুলে সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলো, বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে শৃঙ্খলা এলো, অবাধ্যতার বদলে এলো আনুগত্যশীলতা, স্থবিরতার বদলে গতিশীলতা।

উম্মতে মোহাম্মদীর উদ্দেশ্যচ্যুতি

রসুলাল্লাহর নবুয়্যতের পরে ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত উম্মতে মোহাম্মদী একদেহ একপ্রাণ হয়ে সেই সংগ্রাম চালিয়ে গেল। তারা বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করল। এরপর ঘটল এক মহা-দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ঐ জাতি হঠাৎ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেল। জাতি ভুলে গেল যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে, প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সেই কাজ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। জাতির লোকদের আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় জাতি ঠিক তাই করল। তারা আল্লাহর দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ত্যাগ করল এবং ত্যাগ করে অন্যান্য রাজা বাদশাহরা যেমন রাজত্ব করে তেমনি শান শওকতের সঙ্গে তাদের মতই রাজত্ব করতে শুরু করল। এই সর্বনাশা কাজের পরিণতি কী তা তারা উপলব্ধি করতে পারলেন না। তারা উপলব্ধি করতে পারলেন না যে, যে জিনিস যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় সেটা যদি সেটাকে দিয়ে না হয়, তবে আর ঐ

জিনিসের কোনো দাম থাকে না, সেটা অর্থহীন হয়ে যায়। একটা ঘড়ির উদ্দেশ্য হচ্ছে সময় জানা, ঘড়িটা যদি না চলে, সময় না দেখায়, এমন কি যদি ভুল সময় দেখায় তবে আর সে ঘড়িটার কোনো দাম থাকে না। ঘড়িটা সোনা, হীরা জহরত দিয়ে তৈরি করলেও না।

মো'মেনের সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুতি

শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করার মোহ তাদের এমনভাবে পেয়ে বসল যে তারা ভুলে গেলেন আল্লাহ কোর'আনে মো'মেন হবার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে ঐ সংগ্রাম অঙ্গীভূত করা আছে। সুরা হুজরাতের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-"সত্যনিষ্ঠ মো'মেন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর (সে সম্বন্ধে) আর কোনো সন্দেহ করে না (অর্থাৎ এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ়, অবিচল থাকে) এবং তাদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে।" আল্লাহ প্রদত্ত মো'মেনের এই সংজ্ঞা থেকে জাতি বিচ্যুত হয়ে গেল।

তারা ভুলে গেলে যে, রসুলাল্লাহর কাজই উম্মতের কাজ। বিশ্বনবী (সা.) তাঁর উম্মাহকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার চলে যাবার পর তিনি যেমন করে সংগ্রাম করে সমস্ত আরবে দীন প্রতিষ্ঠা করলেন, ঠিক তেমনি করে বাকি দুনিয়ায় ঐ দীন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হবে। এটাকে নবীজী (সা.) বললেন, "আমার প্রকৃত সুন্নাহ", অর্থাৎ আমি সারা জীবন যা করে গেলাম, এবং এও বললেন যে, যে আমার এই সুন্নাহ ত্যাগ করবে সে বা তারা আমার কেউ নয় (বোখারী, মুসলিম); অর্থাৎ আমার উম্মত নয়। তারা উম্মতে মোহাম্মদীর দাবি করতে পারে না।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম যিনি মহানবী (সা.) কে প্রেরিত বলে স্বীকার করে এই দীনে তথা ইসলামে প্রবেশ করলেন; অর্থাৎ আবু বকর (রা.) মুসলিম হয়েই রসুলাল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞেস করলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এখন আমার কাজ কী? কর্তব্য কী? মহান আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী (সা.) উত্তর দিয়ে বললেন, "এখন থেকে আমার যে কাজ তোমারও সেই কাজ"। ইতিহাসে পাচ্ছি, শেষ ইসলামকে গ্রহণ করার দিনটি থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আবু বকরের (রা.) কাজ একটাই হয়ে গিয়েছিল, সেটা ছিল মহানবীর (সা.) সংগ্রামে তার সাথে থেকে তাকে সাহায্য করা। শুধু আবু বকর (রা.) নয়, যে বা যাঁরা নবীজী (সা.) কে বিশ্বাস করে মুসলিম হয়েছেন সেই মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বা তারা বিশ্বনবীকে (সা.) তার ঐ সংগ্রামে সাহায্য করে গেছেন, তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ পালন করে গেছেন। আর কেমন সে সাহায্য! স্ত্রী-পুত্র পরিবার ত্যাগ করে, বাড়ি-ঘর সহায়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে, অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে, নির্মম অত্যাচার সহ্য করে, গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত জীবন বিসর্জন দিয়ে। এই হলো তাঁর উম্মাহ, উম্মতে মোহাম্মদী তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী জাতি।

কিন্তু এর ৬০/৭০ বছর পর এই জাতি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হলো না। তারা রসুলের সুন্নাহরও ভিন্ন সংজ্ঞা আবিষ্কার করল। ইতিহাস সাক্ষী যতদিন তিনি এই দুনিয়ায় ছিলেন ততদিন তিনি ও তাঁর আসহাব একদেহ একপ্রাণ হয়ে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। তারপর যখন আল্লাহর রসুল এই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তখন ঐ দায়িত্ব স্বভাবতই এসে পড়লো তাঁর গঠন করা জাতিটির ওপর। শুধু আরব দেশটাকে ঐক্য, শৃঙ্খলা, ন্যায়, সুবিচারের মধ্যে আনা হয়েছে; বাকি পৃথিবী অন্যায়-অবিচারের মধ্যেই ডুবে আছে। রসুলাল্লাহর নিজ হাতে গড়া জাতিটি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, উম্মতে মোহাম্মদীর অস্তিত্বের অর্থই হলো তাদের নেতা বিশ্বনবীর সুন্নাহ অনুসরণ করা। তারা তাদের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে, নেতার দুনিয়া থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, পরিবার পরিজন, এক কথায় পার্থিব সব কিছু কোরবান করে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করতে তাদের স্বদেশ আরব থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রসুলের আসহাবরা দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর সেই সংগ্রাম যখন ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন নবীর সুন্নাহর বিকল্প হিসাবে নেয়া হলো তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি যেগুলোর সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের কোনো সম্বন্ধই নেই; যেগুলো নেহায়েৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, জেহাদ ত্যাগকারীদের কাছে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর সুন্নাহ হয়ে দাঁড়াল, তাঁর বিপ্লব নয়, তাঁর মেসওয়াক করা, খাবার আগে জিহ্বায় একটু নিমক দেওয়া, খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া, ডান পাশে শোয়ার মত ছোট-খাটো অসংখ্য তুচ্ছ ব্যাপার। ঐ মহাবিপ্লবীর তেইশ বছরের বৈপ্লবিক জীবন তাদের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো না, তাদের কাছে মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল নবী নুরের তৈরি নাকি মাটির তৈরি এই অহেতুক বিতর্ক! মানুষের ইতিহাসে কোনো জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন করেছে বলে আমাদের জানা নেই। আল্লাহও তার শাস্তি দিতে ছাড়েন নি। সেই সুদূর পূর্বপ্রান্ত থেকে পাহাড়ি মোঙ্গলদের নিয়ে এসে হালাকু খানকে দিয়ে শাস্তি দেওয়ালেন। হালাকু খান এই জাতির খলিফাকে বস্তায় ভরে ঘোড়ার ক্ষুর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করল। বাগদাদের মাটি রঞ্জিত হলো লক্ষ লক্ষ মুসলমানের রক্তে। তাদের কর্তিত মস্তক দিয়ে পিরামিড বানানো হলো। আর দ্বীনের অতি বিশ্লেষণ করে, তর্ক-বাহাস করে, এই জাতির পণ্ডিতরা যে কিতাবের স্তূপ গড়ে তুলেছিলেন সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে সমস্ত জ্ঞানের অহংকার চুরমার করে দিল। এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষত শুকাতে একশ' বছর লেগেছে। কিন্তু তবুও জাতির হুঁশ হলো না। তারা অন্তর্মুখিতা ত্যাগ করে সংগ্রামে বের হলো না। জঘন্য ভোগ-বিলাসিতা পরিহার করল না। ঐক্যবদ্ধ হলো না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসলা-মাসায়েল নিয়ে তর্ক বাহাস বন্ধ করল না। হুজরায়, খানকায়

চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বসে আত্মার ঘষা-মাজা ত্যাগ করে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করল না। ফলে আল্লাহ এবার চূড়ান্ত শাস্তির আয়োজন করলেন। আল্লাহ সুরা তওবায় ৩৮ এবং ৩৯ নং আয়াতে এই জাতিকে সংগ্রাম ছেড়ে দেবার পরিণতি সম্বন্ধে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন- "যদি তোমরা (সত্য, ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা এক কথায় শান্তি প্রতিষ্ঠার) সংগ্রামে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোনো জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন" অর্থাৎ তোমাদের অন্য কোনো জাতির দাস, গোলাম বানিয়ে দেবেন। এই কঠোর সতর্কবাণী সত্ত্বেও আকিদা অর্থাৎ জাতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক সম্যক ধারণার (Comprehensive Conception) বিকৃতিতে যখন এই জাতি সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে নফসের সাথে নিরাপদ জেহাদ করে যেতে লাগল তখন আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলিকে দিয়ে ঐ জাতিকে সামরিকভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে শাসনভার ও কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিলেন। ঐ জাতিকে দাসে পরিণত করার পর খ্রিস্টান প্রভুরা তাদের উপরে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজেদের তৈরি করা জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দিল।

দাসত্বের যুগঃ শিক্ষাব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র

ভবিষ্যতে এই জাতিটি যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য খ্রিস্টান শাসকরা কিছু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করল। তার একটি হচ্ছে তারা তাদের অধিকৃত মুসলিম দেশগুলিতে পাশাপাশি দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করল। একটি সাধারণ শিক্ষা এবং অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষা। বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শাসকরা তাদের পছন্দমত একটি ইসলাম শিক্ষা দেবার জন্য তাদের অধিকৃত সমস্ত মুসলিম দুনিয়ায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। এই মাদ্রাসায় "ইসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য খ্রিস্টান পণ্ডিতরা বহু গবেষণা করে একটি নুতন "ইসলাম" দাঁড় করালেন, যে "ইসলামের" বাহ্যিক দৃশ্য ইসলামের মতই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটার আকিদা এবং চলার পথ আল্লাহর রসুলের ইসলামের ঠিক বিপরীত। এই সিলেবাসে নামাজ, রোযা, বিয়ে-শাদী, বিবি তালাক, দাড়ি-টুপি, পাজামা, পাগড়ি, মেসওয়াক, কুলুখ, অযু-গোসল, হায়েয-নেফাস ইত্যাদি হাজার রকমের বিষয়গুলিকে ইসলামের অতি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উপরে স্থান দেয়া হলো। পক্ষান্তরে তওহীদকে ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত করা হলো এবং তওহীদের ঠিক পরেই যে জেহাদের স্থান সেই জেহাদকে অতি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত করে প্রায় বাদ দেওয়া হলো। এই শিক্ষাব্যবস্থায় অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি করে রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পথ না থাকে এবং যেন তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত ইসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু করল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। এ ভাগটা তারা করল তাদের এই বিরাট এলাকা শাসন করার জন্য সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজ করার উপযুক্ত জনশক্তি তৈরি করতে। তারা এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখল; সেখানে আল্লাহ, রসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হলো না। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হলো যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনম্মন্যতায় আপ্লুত থাকে এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ (A hostile attitude) সৃষ্টি হয়। এই শিক্ষিত শ্রেণির কাছে ধর্ম হয়ে গেল অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে অচল, মধ্যযুগের বানানো কল্পকাহিনী মাত্র।

আজ আমাদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত হচ্ছে পাশ্চাত্যের তৈরি করা নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে আর ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে আল্লাহ ও রসুলের ইসলামের বিপরীত শিক্ষা দিয়ে, যেটা ইউরোপীয়ানরা মাদ্রাসায় শিক্ষা দিয়ে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে এরপরও আমরা নিজেদের মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে বিশ্বাস করি এবং পরকালে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের আশা করি!

আল্লাহ কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে এবং সুরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে মো'মেনদের এই পৃথিবীর আধিপত্য ও কর্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্যত্র বলেছেন, তোমরা হীনবল হয়ো না, দুর্বল হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মো'মেন হও। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে যতদিন ঐ জাতি, জাতি হিসাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে ততদিন আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন- অর্ধেক পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐ জাতি যদি তখন সংগ্রাম ত্যাগ না করত তবে অবশ্যই আল্লাহ বাকি অর্ধেকও তাদের হাতে তুলে দিতেন। আল্লাহর ঐ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে আরেকটি সত্য ফুটে ওঠে- সেটা হলো, আমরা নিজেদের মো'মেন অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসী বলে দাবি করি। তাহলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর কর্তৃত্ব, আধিপত্য আমাদের হাতে নেই কেন? তাহলে সেই সর্বশক্তিমান কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অসমর্থ (নাউযুবেল্লাহ মেন যালেক)? এর একমাত্র জবাব হচ্ছে- আমরা যতই নামাজ পড়ি, রোযা রাখি, যতই হাজার রকম এবাদত করি, যতই মুত্তাকী হই, আমরা মো'মেন নই, মুসলিম নই, উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

মো'মেন হলে (ইন কুন্তুম মো'মেনিন) যে পৃথিবীর ওপর আধিপত্যের অঙ্গীকার আল্লাহ করেছেন, সেই পৃথিবীতে আজ আমাদের অবস্থা কী? আমাদের অবস্থা হচ্ছে:

- পৃথিবীতে যে কয়টি প্রধান জাতি আছে তার মধ্যে আমরা নিকৃষ্টতম।

- আমাদের ছাড়া আর যে কয়টি জাতি আছে তারা সকলেই পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের অপমানিত, অপদস্ত, করছে, আমাদের আক্রমণ করে হত্যা করছে, আমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে, আমাদের বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মা, মেয়ে, বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে সতীত্ব নষ্ট করছে।
- ইসলাম অর্থ শান্তি। অথচ এই জাতি নিজেরা হাজার হাজার ভাগে বিভক্ত হয়ে মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত করছে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, গোলামী এক কথায় চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের মুসলিম জনগোষ্ঠীর নির্বিকার হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। আমাদের এহেন পরাজয়ের গ্লানি আর নিপীড়নের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। যদি তা না করি তাহলে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা ছাড়া উপায় নেই। ইতোমধ্যেই জঙ্গিবাদী ইস্যু সৃষ্টি করে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান আজকে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে। সমুদ্রে, নদীতে ডুবে মারা যাচ্ছে অবুঝ শিশু। আর এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই শুরু হয়েছে ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত প্রোপাগান্ডা। এ থেকে মুক্তির জন্য কী করব আমরা? আমরা কি ইসলাম ত্যাগ করব? আল্লাহ-রসুলের উপর ঈমান হারিয়ে ফেলব? কখনই সেটা পারব না। তাছাড়া আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা তো কয়েক শতাব্দী আগেই ত্যাগ করা হয়েছে, তারপরেও কেবল মুসলিম পরিচয়ের কারণে এই জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের খড়্গ এটাই প্রমাণ করে যে, পরিচয় অস্বীকার করে আমরা বাঁচতে পারব না। নাস্তিক হয়ে বাঁচতে পারব না। দেশত্যাগ করেও বাঁচতে পারব না। আমরা ১৫০ কোটি জনসংখ্যা যদি বাঁচতে চাই তাহলে ধর্মকে ধারণ করেই বাঁচতে হবে, আল্লাহর সাহায্য নিয়েই বাঁচতে হবে, অর্থাৎ মো'মেন হতে হবে। তওহীদের ভিত্তিতে যাবতীয় অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে দল-মত, ফেরকা-মাজহাব, গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে পুরো জাতির প্রতি হেযবুত তওহীদের এই একটিই কেবল দাবি, আসুন ব্যক্তিগত জীবনের মতভেদকে ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ রেখে জাতির স্বার্থে, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কিতাবের অনুসারী হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হই।

মানব কল্যাণই ইসলামের উদ্দেশ্য

সমাজে শান্তি স্থাপনের নামই ইসলাম।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন, আমাদের ফেইসবুক পেজে–

/SYSTEMPALTAI

সরাসরি স্ক্যান করে ভিজিট করুন

ইসলাম নিয়েই বাঁচতে হবে

রাকীব আল হাসান

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের উপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন চলছে তা কারো অজানা নয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর চলছে জাতিগত নিধন অভিযান। সেখানে হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ করে, পুরুষ ও শিশুদেরকে হত্যা করে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে, সমস্ত কিছু লুট করে তাদেরকে সমূলে উৎখাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের উপর চলমান এ নির্যাতন নতুন কোনো ঘটনা নয়, বরং দুনিয়াময় মুসলিমদের উপর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ধারাবাহিক নির্যাতনের অংশ। সাম্প্রতিক অতীতে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে। কোটি কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু শিবিরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মির, কাশগড়, উইঘোর, জিনজিয়াং, বসনিয়া, চেচনিয়াসহ বহু জায়গায় যুগ যুগ ধরে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চলে আসছে। সত্তর বছর ধরে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর ইহুদিরা যা চালিয়ে আসছে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বসনিয়ায় খ্রিস্টান সার্বরা যা করেছে তার নজির মানুষের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। তারা ৭০ হাজার মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেছে। তারপর তাদেরকে সাত মাস পর্যন্ত আটকে রেখেছে যেন তারা খ্রিস্টানদের ঔরসজাত সন্তান গর্ভপাত করে ফেলে দিতে না পারে। এ হলো পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা। যে যেখানে যেভাবে পারছে মুসলিমদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে।

এই লাঞ্ছনার জীবন থেকে বাঁচার জন্য অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ ব্যক্তিগতভাবে কিছু করার চেষ্টা করছেন, কেউ দলগতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি এই অপমানের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় অনেকে নিজের মুসলিম নাম-পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টাও করছেন। ইউরোপ-আমেরিকার কোনো দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কাউকে বিয়ে করছেন, এফিডেভিট করে প্রয়োজনে নিজের নাম পরিবর্তন করছেন। তাও যদি মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণের 'লজ্জা' থেকে বেরিয়ে আসা যায়! কথা হলো, এভাবে কি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব? এতে কি মুক্তি আসবে?

এই লাঞ্ছনার জীবন থেকে বাঁচার জন্য অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ ব্যক্তিগতভাবে কিছু করার চেষ্টা করছেন, কেউ দলগতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি এই অপমানের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় অনেকে নিজের মুসলিম নাম-পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টাও করছেন। ইউরোপ-আমেরিকার কোনো দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কাউকে বিয়ে করছেন, এফিডেভিট করে প্রয়োজনে নিজের নাম পরিবর্তন করছেন। তাও যদি মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণের 'লজ্জা' থেকে বেরিয়ে আসা যায়! কথা হলো, এভাবে কি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব? এতে কি মুক্তি আসবে?

আমি বলবো, না; এই চেষ্টা আমাদেরকে মুক্তি এনে দিতে পারবে না। আমাদেরকে বাঁচতে হলে মুসলিম পরিচয় নিয়েই বাঁচতে হবে, ইসলামকে ধারণ করেই বাঁচতে হবে। ভিন্ন কোনো প্রচেষ্টা আমাদেরকে মুক্তি এনে দিতে পারবে না। কারণ, এ জাতির উপর আজ যা চলছে তা স্পষ্টত আল্লাহর দেওয়া শাস্তি, তাঁর দেওয়া লা'নতের ফসল। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে এই লা'নতের কারণ উপলব্ধি করতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে, কি কারণে আজকে মুসলিম জাতির এই দুর্দশা, এই দুর্গতি। কোথায় আমরা পথ হারিয়েছি? আমরা কোথায় সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর ক্রোধের বস্তুতে পরিণত হয়েছি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। ফের আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করতে হবে। ভিন্ন কোনো প্রচেষ্টা আমাদের মুক্তি দিতে পারবে না।

আল্লাহর রসুল (স.) যখন আরবের কোরায়েশদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন, তখন আরবদের অবস্থা কি ছিল তা ইতিহাস সচেতন যে কোনো ব্যক্তিই জানেন। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, অশ্লীলতা, অনৈক্য, হানাহানি, গোত্রে গোত্রে সংঘাত, রক্তপাত থেকে শুরু করে একটি জাতির পশ্চাৎপদতার প্রতিটি কারণ সেখানে বিদ্যমান ছিল। অজ্ঞতা ও অন্ধকার তাদের এতটাই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে

ধরেছিল যে আরবের ওই যুগকে বলা হয় 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' তথা 'অন্ধকারের যুগ'। তৎকালীন পৃথিবীতে তারাই ছিল সম্ভবত সবচেয়ে অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত ও অবহেলিত জাতি। কিন্তু আল্লাহর রসুল (স.) আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, পরস্পর দাঙ্গা-কলহে লিপ্ত, শতধাবিচ্ছিন্ন আরবজাতিকে এক কলেমার উপরে, তওহীদের উপরে, সেরাতাল মোস্তাকিমের উপরে সীসা গলানো প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ করলেন। শতধাবিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতিতে পরিণত করলেন যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী। তারা এক আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানত না। তাদের আদর্শ ছিল রসুলাল্লাহর শেখানো আদর্শ। আল্লাহর রসুল তাদেরকে এক অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করলেন। তারা একদিকে উন্নত নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান হয়ে উঠল, অন্যদিকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হলো। তাদের সমাজ শান্তিতে, নিরাপত্তায়, সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এ জাতির নেতা রসুলাল্লাহ (সা.) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার আগে বার বার জাতিকে সাবধান করে গেলেন, "তোমরা আল্লাহর হুকুমকে (কোর'আন), আমার সুন্নাহকে আকড়ে ধরে থাকবে। পরস্পর বিবাদ করবে না, অনৈক্য করবে না। এক ভাই অন্য ভাইকে হত্যা করবে না।"

কিন্তু আমরা আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করে পাশ্চাত্য ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী সভ্যতার তৈরি হুকুম-বিধান-আইন গ্রহণ করেছি। আদর্শ হিসাবে রসুলাল্লাহ (সা.) কে প্রত্যাখ্যান করেছি। একজাতিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছি। শিয়া, সুন্নি, হানাফি, হাম্বলি, শাফেয়ি, মালেকি বহু ফেরকা, মাজহাবে বিভক্ত হয়েছি, বহু দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে হানাহানি করেছি। এক ভাই অন্য ভাইকে হত্যা করে চলেছি। রসুলাল্লাহর সাবধানবাণী ভুলে গিয়েছি, আল্লাহর হুকুমও ভুলে গিয়েছি। ফলস্বরূপ মহান আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তিস্বরূপ একবার পাঠালেন চেঙ্গিস খান, হালাকু খানদেরকে। তারা এসে মুসলিমদেরকে কচু-কাটা করল। তখনকার বাগদাদে ২০ লক্ষ মুসলিম ছিল যাদের মধ্যে ১৬ লক্ষ মুসলিমকে তারা হত্যা করল। খলিফা মুতাসিমবিল্লাহকে নির্মমভাবে হত্যা করল। মুসলিমদের মাথার খুলিগুলো একজায়গায় জড়ো করে পিরামিডের মতো আকৃতি দিল। কিন্তু এরপরও জাতির হুঁশ হলো না, তখনও তারা ঐক্যবদ্ধ হলো না। আবারও তারা নিজেদের মধ্যে বিভেদ, বিতর্ক, হানাহানি আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বাড়াবাড়ি করে জাতিটাকে স্থবির করে রাখল। সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দিয়ে ভোগ-বিলাসে ডুবে রইল। আল্লাহ পুনরায় শাস্তি পাঠালেন। ব্রিটিশ, ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজসহ ইউরোপীয় জাতিগুলোর দাস বানিয়ে দিলেন। সেই আটলান্টিকের তীর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মুসলিম জাতিটি তাদের গোলাম হয়ে গেল।

একই সাথে দুই মালিকের দাসত্ব করা যায় না। ইউরোপীয়রা মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলো দখল করার পর তাদের উপর নিজেদের শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিল। এভাবে এই মুসলিম নামক জাতি আল্লাহর দাসত্ব থেকে সরে এসে কার্যত খ্রিস্টানদের দাসত্ব করতে লাগল। আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে তাদের হুকুম-বিধান নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হলো। তাদের তৈরি আইন, তাদের তৈরি বিচারব্যবস্থা, শাসন পদ্ধতি, সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনৈক্য ও হানাহানির রাজনৈতিক সিস্টেম সবকিছু গ্রহণ করে নিলাম সেই খ্রিস্টানদের থেকে। আদর্শ হিসাবে রসুলাল্লাহকে (সা.) বাদ দিয়ে আমরা গ্রহণ করে নিলাম আব্রাহাম লিংকন, কার্লমার্কস, লেলিন, ম্যাকিয়েভেলি, হ্যাগেল, এ্যাঙ্গেল প্রমুখদেরকে। আল্লাহর হুকুম, রসুলাল্লার আদর্শ, তাঁর দেওয়া কর্মসূচি সব প্রত্যাখ্যান করে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে নামাজ-রোজাসহ কিছু উপাসনা করে নিজেদেরকে আমরা মুসলিম দাবি করছি। আসলেই কি এভাবে মুসলিম থাকা যায়?

আমরা গোলাম হয়ে তাদের সমস্ত কিছু গ্রহণ করে নিলাম, তাদের তৈরি শিক্ষাব্যবস্থাও গ্রহণ করলাম। তারা বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নাস্তিকতার শেকড় গেড়ে দিল আমাদের মননে। আজ বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটির বড় একটা অংশই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, বিদ্বেষপূর্ণ ভাব পোষণ করে। তারা মনে করে কোর'আন মানুষের রচনা করা প্রাচীন একটা গ্রন্থ যা এই যুগে অচল, মধ্যযুগের বর্বর আরবজাতির জন্য এটা প্রয়োগযোগ্য হলেও বিজ্ঞানের এই যুগে এটা চলবে না। জান্নাত, জাহান্নাম, আখেরাত এগুলো সব বানানো গল্প মাত্র। তারা কেবল এটা বিশ্বাসই করে না তারা এটা প্রচারও করে। তারা মনে করে নাস্তিকতার প্রচার করলে পশ্চিমা দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে, সেখানে গিয়ে আরাম-আয়েশে জীবন পার করা যাবে। কিন্তু তাদেরকে বুঝতে হবে নাস্তিক পরিচয় দিয়েও আপনি বাঁচতে পারবেন না। আপনি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-নাস্তিক যাই হোন না কেন, আল্লাহর আযাব আপনার পেছনে পেছনে ধাওয়া করবে। নাম পাল্টে মোহাম্মদ থেকে উইলিয়াম করতে পারেন কিন্তু আপনাকে তারা মুসলিম হিসাবেই দেখবে এবং অবিশ্বাস করবে। গত কয়েক শতাব্দী থেকে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে চালাতে পুরো মানবজাতির মধ্যে একটা ধারণা প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে- মুসলিমরা খারাপ, মুসলিমরা জঙ্গি-সন্ত্রাসী; ইসলাম মৌলবাদি, কূপমণ্ডূক, ধর্মান্ধ, যুক্তিবোধহীন। অন্য সকল জাতিই

এখন মুসলিমদেরকে ঘৃণা করে। মুসলিম যেই দেশে থাকবে সেই দেশেই বিপদ। কাজেই এদেরকে রাখা যাবে না, তাদেরকে ইউরোপ-আমেরিকায় প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। আজকে এভাবে সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বহু প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি, মুসলিমদের প্রতি একটা ভীতি তৈরি হয়ে গেছে। ইউরোপে এটার নাম দিয়েছে 'ইসলামোফোবিয়া' অর্থাৎ ইসলামভীতি। 'মুসলিম! ওরে বাপরে বাপ!!' কিছুদিন আগে পত্রিকায় এসেছে, পোল্যান্ড এবং জার্মানির কয়েকশত মাইল লম্বা সীমান্ত এলাকার মধ্যে প্রায় পাঁচশত গীর্জায় প্রার্থনা সভা হয়। হাজার হাজার খ্রিস্টান যোগ দেয় ওই প্রার্থনা সভায়। প্রার্থনার মূল বিষয় ছিল- কোনো মুসলিম যেন ইউরোপে ঢুকতে না পারে। একটা এন্টি-ইসলামিক মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। ভারতে, ইউরোপে, আমেরিকায়, সর্বত্র। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে আসছেন। এখন অবস্থা এমন যে, মুসলিমরা যেন শুধুই মার খাবে। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে 'মুসলিম তাড়াও' অভিযানে নেমেছে। এখন কোথায় যাবেন। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে তো এখানে আসলেন, এখানেও যদি শুরু হয় তাহলে কোথায় যাবেন? যাওয়ার জায়গা নেই, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

এই দুর্দশা থেকে এখন বাঁচতে হলে আত্মপরিচয় মুছে দিয়ে লাভ নেই। লা'নত আপনার পিছু পিছু ধাওয়া করবে। বাঁচতে হলে মুসলিম পরিচয় নিয়েই বাঁচতে হবে। আবার ইসলামকে ধারণ করতে হবে। যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় এসে বর্বর আরবরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হয়েছিল সেই পরশ পাথর আবার খুঁজে নিতে হবে। আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে আপনারা কয়েক শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টানের হুকুম মেনে নিয়েছেন, বাঁচতে পারছেন কোথাও? সুতরাং খ্রিস্টা কিংবা নাস্তিক হয়েও বাঁচতে পারবেন না। এখন আপনারা প্রায় সাত কোটি উদ্বাস্তু। বাড়ি নেই, ঘর নেই, বসবাসের জায়গা নেই। পলিথিন ব্যাগের ভেতর গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। মান-সম্মান, ইজ্জত সব শেষ। কাজেই মুসলিমদেরকে এখন বাঁচতে হলে একটা কথার উপরে তাদেরকে আসতে হবে, আমাদের ইসলাম নিয়ে বাঁচতে হবে, মুসলিম পরিচয়েই বাঁচতে হবে। এখন আমাদেরকে তওবা করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। আমরা ছিলাম আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা। আল্লাহ আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমাদের প্রিয় নবীকে (সা.) পাঠিয়েছিলেন একটা কিতাব দিয়ে, আমরা আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছি। এখন তওবা করে মুসলিমদেরকে এই পরিচয় দিতে হবে যে, আমরা মুসলিম। এখানে একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে, আজ তো বহু রকমের 'ইসলাম' সমাজে চালু আছে, তাহলে আমরা কোন্ ইসলাম গ্রহণ করব? কোন্ ইসলাম আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে মুক্তি দেবে? একেক পীরের একেক ইসলাম, একেক তরিকা। সেখানে গিয়ে আত্মার ঘষা-মাজা করো আর তাদেরকে টাকা দাও। মুসলিম জাতির মুক্তি নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। আবার রাজনৈতিকভাবে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন ধরন, বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভিন্ন রূপরেখা। তাহলে মানুষ কোন্ ইসলাম গ্রহণ করবে? বলার অপেক্ষা রাখে না, যে বিকৃত ইসলাম বর্তমানে দুনিয়াজুড়ে প্রচলিত আছে তা দিয়ে এই জাতি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারবে না। যদি পারতো তাহলে আগেই পারতো।

যে ইসলাম মানবজাতির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করবে, যে ইসলাম সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করবে, সমৃদ্ধ করবে, যে ইসলাম মানুষের অন্ধত্ব দূর করবে, আমাদের কূপমণ্ডূকতা দূর করবে, যে ইসলাম মানুষকে চিন্তা-ভাবনায় সভ্য করবে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে, নৈতিক চরিত্রে, নব নব আবিষ্কারে এক কথায় সকল দিক থেকে আমাদেরকে শিক্ষকের আসনে নিয়ে যাবে সেই ইসলাম গ্রহণ করতে পারলে আমরা মুসলিম হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। সেটা কোন্ ইসলাম? আল্লাহর রসুল পৃথিবীতে যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন সেই ইসলাম। প্রশ্ন হতে পারে, সেই ইসলাম কি এখন পৃথিবীতে আছে? উত্তরে বলব, হ্যাঁ, রসুলাল্লাহর সেই প্রকৃত ইসলাম আবার মহান আল্লাহ অতীব দয়া করে মাননীয় এমামুয্‌যামানকে তথা হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। শত শত বছরের অজস্র বিকৃতির আড়ালে চাপা পড়ে আছে যে সহজ-সরল সত্যিকার ইসলাম, হেযবুত তওহীদ মানুষের সামনে সেই ইসলামটিই তুলে ধরছে। এখন এই মুসলিম নামক জাতিকে বাঁচতে হলে একটাই পথ, তাদেরকে এই প্রকৃত ইসলাম ধারণ করতে হবে। আল্লাহর তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তা না হলে তারা আর বাঁচবে না। তারা এতদিন সমাজতন্ত্রী হয়েছে, গণতন্ত্রী হয়েছে, মাওবাদী হয়েছে, লেলিনপন্থী হয়েছে, পশ্চিমাপন্থী হয়েছে কিন্তু তারা বাঁচতে পারেনি। এগুলো করে করে আমরা নিজেরা নিজেরা শত শত ভাগে বিভক্ত হয়েছি। ভূখণ্ডগতভাবে, শরীয়াগতভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, এক কথায় সর্বপ্রকারে আমরা বিভক্ত হয়েছি। যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে আগামীতেও আমাদের চোখের সামনে আমাদের নারীরা ধর্ষিতা হবে, আমাদের যুবকেরা বেয়নেটের খোঁচায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, আমাদের বৃদ্ধ ও শিশুদেরকেও মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করা হবে। আমরা কিছুই করতে পারব না। আমাদের ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি সমস্ত কিছু আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হবে, আমরা অসহায়ের মতো শুধু চেয়ে দেখব, প্রতিরোধ করতে পারব না।

ইসলাম কীভাবে মানুষের হৃদয় জয় করেছিল?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর রসুল যখন পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, দেখা গেল আদর্শ হিসেবে ইসলামের স্বরূপ প্রকাশিত হবার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। ইসলামের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। এশিয়া থেকে আফ্রিকা, আফ্রিকা থেকে ইউরোপ, সর্বত্রই ইসলামের একটা জয়জয়কার পড়ে গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মুসলমানদের ঘোর শত্রুও ইসলামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই দীনকে গ্রহণ করে নিচ্ছিল। অল্প দিনের মধ্যে আদর্শ হিসেবে ইসলামের এমন যুগান্তকারী উত্থান ঘটল যার সম্মুখে সমসাময়িক সকল আদর্শ, সকল মতবাদ আবেদন হারিয়ে বর্ণহীন হয়ে গেল।

ইসলামের প্রতি মানুষের এই অভাবনীয় আকর্ষণের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে-

- ইসলাম অনৈক্য-হানাহানিতে লিপ্ত দাঙ্গাবাজ আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিল।
- বংশানুক্রমিক শত্রুতা আর রক্তপাতে নিমজ্জিত আরব জাতিকে একে অপরের ভাই বানিয়ে দিয়েছিল। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরবর্তীতে অর্ধপৃথিবীকে বেঁধেছিল সেই প্রকৃত ইসলাম।
- আরব-অনারব, আশরাফ-আতরাফ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষরের আকাশ-পাতাল মর্যাদার ব্যবধান দূর করতে পেরেছিল।
- যে সমাজে দাসদেরকে মানুষ মনে করা হত না, সেই সমাজের ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) ক্বাবার ঊর্ধ্বে উঠিয়ে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহর রসুল বুঝিয়ে দিলেন- সবার ঊর্ধ্বে মানুষ, সবার উপরে মানবতার স্থান। আল্লাহর কাছে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের মূল্য তাঁর ক্বাবার চেয়েও অধিক। ইসলামের এই সাম্যবাদী আদর্শ লক্ষ লক্ষ বেলালদের অন্তরে মুক্তির তুফান সৃষ্টি করেছিল, ইসলামকেই তারা মুক্তির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।
- ইসলাম সাম্প্রদায়িক বিভাজনের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে যা ওই সমকালীন বিশ্বে কল্পনাও করা যেত না। সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-বংশের মানুষ নিয়ে মদীনায় 'ঐক্যবদ্ধ জাতি' গঠন করে আল্লাহর রসুল প্রমাণ করে দেন- 'ইসলামে বিভক্তি নয়, ঐক্যই মূল শিক্ষা। কে কোন ধর্মের, কে কোন বর্ণের, কে কোন গোত্রের- তা দিয়ে মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় না। যে ব্যক্তি ন্যায় ও সত্যকে ধারণ করবে ইসলাম তাকেই আলিঙ্গন করবে।' ফলে ইসলামের এই সার্বজনীনতার কাছে অন্য সব আদর্শ ম্রীয়মাণ হয়ে পড়ে।
- নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষ, যারা বেঁচে থাকত রাজা-বাদশাহ, যাজক-পুরোহিত আর সমাজপতিদের কৃপাগুণে, সমাজে যাদের ন্যূনতম অধিকার ছিল না, সম্মান ছিল না, যাদের মাথাকাটা যাবার জন্য সমাজপতিদের একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিল, সেই মানুষগুলো ইসলামের ন্যায়বিচার দেখে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যে সম্মান তারা কল্পনাও করতে পারত না ইসলাম তাদেরকে তার চেয়েও অধিক সম্মান দিয়েছে। ওই দাসশ্রেণির মানুষই তাদের 'আমীরুল মু'মিনিনের' গায়ের জামা কীভাবে বানানো হলো তার কৈফিয়ত চেয়েছে, জনসম্মুখে জবাব দিতে হয়েছে অর্ধ-পৃথিবীর শাসককে। এমন দৃষ্টান্ত আজকের যুগে কল্পনা করা যায়?
- ইসলাম ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়েছে, বাস্তুহারাকে বাসস্থান দিয়েছে। কে কোথায় কী সমস্যায় পড়ে আছে তার সমাধান করার জন্য রাতের আঁধারে রাস্তাঘাটে, অলি-গলিতে হেঁটেছে ইসলামের খলিফা, অর্ধপৃথিবীর শাসনকর্তা। ক্ষুধার্ত মানুষের বাড়িতে নিজের কাঁধে করে আটার বস্তা পৌঁছে দিয়েছে।
- যখন সারা বিশ্বে শক্তিমানের কথাকেই আইন ভাবা হচ্ছিল, বিরাট-বিরাট অট্টালিকায়, মনি-মুক্তাখচিত রাজপ্রাসাদে অস্বাভাবিক ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে বসবাসরত 'সম্রাট'দের কাছে নিজেদের ফরিয়াদ জানানো তো দূরের কথা, তাদেরকে এক পলক দেখারও সৌভাগ্য ছিল না সাধারণ মানুষের, সেই সময়েই ইসলামী আদর্শ এমন একটি সমাজ নির্মাণ

করে, এমন সুবিচার ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যে, অর্ধপৃথিবীর শাসনকর্তা একটি খেজুরপাতার ছাউনি দেয়া মসজিদে বসে রাজ্য শাসন করত। যার আবার একটির বেশি জামা ছিল না। যে ব্যক্তি তটস্থ থাকত তার শাসনের অধীনে কেউ কোথাও কষ্ট পাচ্ছে কিনা, একটি কুকুরও না খেয়ে থাকছে কিনা সেই দুশ্চিন্তায়। ঘুম এলে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়তেন। যার যখন ইচ্ছা খলিফার সাথে দেখা করতে পারত, সমস্যা বলত, সমাধান হয়ে যেত।

মূল কথা হচ্ছে ইসলাম মানুষের 'বাস্তব সমস্যার' বাস্তব সমাধান করতে পেরেছিল। যখন মানুষের সমস্যা ছিল অধিকারহীনতা, অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, স্বাধীনতাহরণ, শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য; তখন ইসলাম মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিতে পেরেছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিল ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তা। ওই ন্যায় ও শান্তি দেখেই কোটি কোটি মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরকালীন মুক্তির ব্যাপারও ছিল, তবে মুখ্য বিষয় ছিল মানুষের পার্থিব মুক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান করত যে দীন, সেই দীন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আজ আমাদের ইসলাম অন্য ইসলাম। এই ইসলাম পালন করে মিনিটে মিনিটে লক্ষ-কোটি নেকি কামাই করা যায়, অন্যায়-অবিচারের কষাঘাতে জর্জরিত দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত মানুষকে জান্নাতের আশ্বাস দিয়ে আত্মিক প্রশান্তিও প্রদান করা যায়, কিন্তু যেহেতু এ ইসলাম মানুষের বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যেহেতু এ ইসলাম ইহজাগতিক বিষয়কে এড়িয়ে নিছক পারলৌকিক মুক্তির উপায় হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে সুতরাং স্বভাবতই সে তার আকর্ষণক্ষমতা হারিয়েছে। আদর্শ হিসেবে ইসলামের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হবার এটাই প্রধান কারণ। আজকে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া ছেলে-মেয়েদেরও ঘোর ইসলামবিদ্বেষী হতে দেখা যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, আমরা কখনও খতিয়ে দেখেছি?

এদিকে সাধারণ মানুষ এখন পশ্চিমা বাদ-মতবাদগুলোকে ভরসা করতে শিখেছে। এসব তন্ত্র-মন্ত্র মানুষের প্রকৃত শান্তি নিশ্চিত করতে পারুক বা না পারুক, এদের কিছু বাণী আছে, কিছু মূল্যবোধ আছে, কিছু আশ্বাস আছে যা মানুষকে মুক্তির মরীচিকা দেখিয়ে টেনে রাখতে পারে। অন্যদিকে ধর্মের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। কারণ, আমাদের আলেমরা, আমাদের ধর্মজ্ঞানী

যখন মানুষের সমস্যা ছিল অধিকারহীনতা, অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, স্বাধীনতাহরণ, শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য; তখন ইসলাম মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিতে পেরেছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিল ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তা। ওই ন্যায় ও শান্তি দেখেই কোটি কোটি মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরকালীন মুক্তির ব্যাপারও ছিল, তবে মুখ্য বিষয় ছিল মানুষের পার্থিব মুক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান করত যে দীন, সেই দীন আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

পণ্ডিতরা দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে ভাবনাকে মনে করেন 'দুনিয়াদারী'। সাধারণ মানুষকেও তাই শেখানো হয়। মানুষকে বোঝানো হয় পৃথিবীর জীবন তুচ্ছ বিষয়, পরকালের জীবনটাই আসল জীবন। ওই জীবনের জন্য রসদ সংগ্রহ কর, যত পার নেকি কামাও, দুনিয়াতে কী হচ্ছে না হচ্ছে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট কর না। দুনিয়া শয়তানের, পরকাল মু'মিনদের। এর ফলে যারা পরকাল নিয়ে ভাবছে, অর্থাৎ ধার্মিক শ্রেণি, তারা পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার দেখেও নিশ্চুপ থাকছে। অপরদিকে যারা পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার দেখে ব্যথিত হয়, মানুষের মুক্তির জন্য কিছু করতে চায়, তারা ধর্মের প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মবিদ্বেষী হয়ে যাচ্ছে।

এই যে আল্লাহ-রসুলের ইহকাল-পরকালের ভারসাম্যপূর্ণ দীনকে ভারসাম্যহীন করে ফেলা এবং তার পরিণতিতে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ রসুলকে পাঠিয়েছেন, যে উদ্দেশ্যে দীনুল হক্ব পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যই অবাস্তবায়িত থেকে যাওয়া- এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। এখনও যদি আমরা ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে না পারি, যদি গুরুত্বের অগ্রাধিকার বুঝতে ব্যর্থ হই, আমাদের কৃতকর্মের কারণে দুনিয়াতে ইসলাম কলঙ্কিত হয়, তাহলে হাশরের ময়দানে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কাছে কঠোর জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতিকে পৃথিবীতে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি দেওয়া এবং পরকালে জান্নাত দেওয়া। পৃথিবীকে অন্যায়-অসত্যের হাতে সোপর্দ করে যতই ধর্ম-কর্ম করা হোক তা স্রষ্টার কাছে গৃহীত হবে না।

দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে আল্লাহ ও রসুলের বাণী

মোস্তাফিজুর রহমান শিহাব

ইসলাম হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ দীন। দেহ-আত্মা ও দুনিয়া-পরকালের সুন্দর ভারসাম্য বজায় রেখে আল্লাহ এই দীন তৈরি করেছেন। আবার দীনকে এমন সহজ-সরল করা হয়েছে যাতে চালাক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই নয় কেবল, কম বুদ্ধির লোকও খুব সহজেই এই দীনকে বুঝতে ও ধারণ করতে পারে। তাই ইতিহাসে দেখি, ইসলাম নামক পরশপাথরের ছোঁয়ায় আল্লাহর রসুল যে উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটি গড়ে তুলেছিলেন তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই লেখাপড়া না জানলেও সত্যদীন বুঝতে তাদের কোনো অসুবিধাই হয় নি। সহজ-সরল ইসলামের আলোয় আলোকিত এই নিরক্ষর ব্যক্তিদের প্রসঙ্গেই আমরা আল্লাহর রসুলকে বলতে শুনি, 'আমার আসহাবরা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, তাদের যে কাউকে অনুসরণ করলে সঠিক পথ পাবে।'

ইসলাম যদি সহজ-সরল দীন না হত, তাহলে ঐ লেখাপড়া না জানা নিরক্ষর ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব হত না আল্লাহর দীন বুঝে আল্লাহর রসুলের সংগ্রামী জীবনের সঙ্গী হওয়া। সেই জাতির জীবন ছিল দেহ-আত্মা, ইহকাল-পরকালের ভারসাম্যপূর্ণ, কোর'আনের ভাষায় যারা কিনা 'উম্মাতা ওয়াসাতা'। কিন্তু দুঃখজনক ইতিহাস হচ্ছে, আল্লাহর রসুলের ইন্তেকালের ৬০/৭০ বছর পরে জাতি তাদের লক্ষ্য হারিয়ে ফেললে ক্রমে ক্রমে এই ভারসাম্য নষ্ট হতে শুরু করল। কেউ আধ্যাত্মিক সাধনা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাকেই নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করল, কেউ আবার অস্বাভাবিক ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত হলো। আবার একটি শ্রেণি দ্বীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সহজ-সরল ইসলামকে জটিল করে তুলতে লাগল। এমনটা যে হবে সে কারণেই হয়ত আল্লাহ ও তাঁর রসুল জাতিকে বারবার সতর্ক করেছিলেন যেন দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা হয়, যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুই করা হয় এবং দ্বীনের সরলতাকে আড়াল করে জটিলতার সৃষ্টি না করা হয়। তেমনি কিছু সতর্কবাণী, যেগুলো আমরা বহু পূর্বেই ভুলে বসে আছি তা পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো-

- আল্লাহ বলেন, "বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না; এবং যে-সম্প্রদায় অতীতে বিপথগামী হয়েছে এবং অনেককে বিপথগামী করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করো না"। (৫:৭৭)
- একদল সাহাবী নিজেদেরকে খোজা করে দরবেশ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে ব্যক্ত করলে আল্লাহ আয়াত নাজেল করে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, "হে ঈমানদাররা! আল্লাহ যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তাকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে আহার করো আর আল্লাহকে ভয় করে চলো যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।" (৫:৮৭-৮৮)
- আল্লাহর রসুল বলেন, "দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতিগোষ্ঠি) এরূপ বাড়াবাড়ির পরিণামে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।" (আহমাদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)
- রসুলাল্লাহ বলেন, "তারা অভিশপ্ত, যারা চুল ফাঁড়তে (দ্বীনের চুলচেরা বিশ্লেষণে) লিপ্ত।" (মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ) রসুলাল্লাহ তিনবার এই কথা উচ্চারণ করলেন।
- হযরত মোহাম্মদ (সা.) বিদায় হজ্বের সময় মুজদালিফায় পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে কিছু প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করতে বললেন। ইবনে আব্বাস (রা) কিছু প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করে আনলেন। রসুলাল্লাহ (সা.) পাথরগুলোর আকার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "হ্যাঁ, এই পাথরগুলোর মতোই ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা জবরদস্তি থেকে সাবধান।"

(ইমাম আহমাদ, আন-নাসাই, ইবনে কাছীর ও হাশীম) এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলমানরা যেন অতি উৎসাহী হয়ে বড় পাথর ব্যবহারের মতো বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত না হয়।

- রসুলাল্লাহ (সা.) বলতেন, "নিজের ওপর এমন অতিরিক্ত বোঝা চাপিও না যাতে তোমার ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তোমাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে ধ্বংস হয়েছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন মঠ-মন্দিরে খুঁজে পাওয়া যায়।" আবু ইয়ালা তার মসনদে আনাস ইবনে মালিকের বরাতে এবং ইবনে কাছীর সুরা হাদীদের ২৭ আয়াতের তাফসীরে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন।
- ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: "একটি লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রসুল, আমি যখনি এই গোশতগুলো খাই তখুনি আমার কামপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তাই আমি গোশত না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" এরপর পরই আয়াত নাযিল হয় এবং ঐ ব্যক্তি সতর্ক হয়ে যান।
- আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, "একদল লোক নবীর সহধর্মিণীদের কাছে এসে রসুলাল্লাহর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এ ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তারা তাদের ইবাদত-বন্দেগিকে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে একজন বললেন, আমি সর্বদা সারারাত নামাজ পড়ব; আরেকজন বললেন, আমি সারা বছর রোজা রাখব এবং কখনো ভাঙ্গবো না। এ সময় আল্লাহর নবী তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, "আল্লাহর শপথ, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য আমারই সবচেয়ে বেশি এবং তোমাদের চেয়ে আমি তাঁকে বেশি ভয় করি; তথাপি আমি রোযা রাখি এবং ভাঙ্গিও, আমি ঘুমোই এবং নারীকে বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহকে অনুসরণ করে না সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"
- একবার মহানবী (সা.) সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে জেহাদে যাচ্ছিলেন। পথে এমন একটা স্থানে বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি করলেন যে জায়গাটা নির্জন, ছায়া ঘেরা এবং একটি পানির ঝরণা আছে। একজন সাহাবা বললেন- আহ! আমি যদি এই সুন্দর নির্জন জায়গাটায় একা থেকে যেতে পারতাম। (অবশ্যই তিনি ওখানে থেকে আল্লাহর এবাদতের কথা বোঝালেন, কারণ এ নির্জনে বসে তো আর ঘর-সংসার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বোঝান নি।) আল্লাহর রসুল ঐ কথা শুনে বললেন- আমি ইহুদি বা খ্রীস্টান ধর্ম নিয়ে আসি নি, আমাদের এ পথ নয়। যার হাতে মোহাম্মদের জীবন তার কসম, আল্লাহর রাস্তায় (শান্তি প্রতিষ্ঠার) যুদ্ধের জন্য শুধু সকাল বা বিকাল বেলার (একবেলা) পথ চলা সমস্ত পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়ে এবং ৬০ বছরের নামাজের চেয়ে বেশি। (হাদীস- আবু ওমামা (রা.) থেকে -আহমদ, মেশকাত)
- রসুলাল্লাহ মুয়াজ ও আবু মুসাকে (রা.) ইয়েমেনে প্রেরণের প্রাক্কালে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, "(জনগণের কাছে ধর্মীয় বিষয়গুলো) সহজ করে তুলে ধরো, কঠিনরূপে নয়। একে অপরকে মান্য করো, বিভেদে লিপ্ত হয়ো না।" (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত)

দুর্ভাগ্যক্রমে আল্লাহ ও রসুলের এত সতর্কবাণী আজ এই জাতির মনে নেই। দ্বীনের ভারসাম্য বহু পূর্বেই হারিয়ে গেছে এবং তার ফলে আমাদের জাতিও ভারসাম্যহীন জনসংখ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। একটি ভাগ আখেরাতের কথা ভুলে ভোগবাদের পেছনে ছুটছে, আরেক ভাগ দুনিয়াবিমুখ হয়ে মসজিদে, হুজরায়, খানকায় ঢুকেছে। আল্লাহ-রসুলের সেই সহজ-সরল ইসলামও এখন নেই, গত ১৩০০ বছরের আলেম-ওলামা, ফকিহ, মোফাসসের, মোহাদ্দীসদের অতি বিশ্লেষণে দীন এতই জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে গেছে যে, তা আর সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী নেই। এমতাবস্থায় অসীম করুণাময় আল্লাহ তাঁর এক বান্দা, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মাধ্যমে সেই সহজ-সরল ভারসাম্যপূর্ণ দ্বীনের জ্ঞান মানবজাতিকে দান করেছেন। সেই প্রকৃত ইসলামের রূপরেখাই সকলের সামনে তুলে ধরছে হেযবুত তওহীদ।

জঙ্গিবাদ ইসলামে নাই তো বুঝলাম, কিন্তু আছেটা কী?

কামরুল আহমেদ

জঙ্গিবাদের অপবাদ যখন ইসলামের উপর আরোপ করা হয় তখন অনেকেই ধর্মকে এই কালিমা থেকে রক্ষা করার জন্য বলে থাকেন ইসলামে জঙ্গিবাদ নেই, সন্ত্রাসের কোনো জায়গা নেই, কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই, মানুষকে হত্যা করার কথা নেই। শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু যারা জঙ্গিবাদী তারা তো ঐ ইসলামের দোহাই দিয়েই, কোর'আন হাদিসের দলিল দেখিয়েই মানুষ জবাই করছে, আত্মঘাতী হয়ে মানুষ হত্যার মত কাজ করছে। তাহলে বিষয়টা কেমন হলো? যারা কেবল বলে যাচ্ছেন ইসলামে এটা নাই, ওটা নাই তাদেরকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে যে ইসলামে আছেটা কী? 'না' তো বুঝলাম, কিন্তু 'হ্যাঁ'-টা কী?

শুধু নাই বললে তো চলবে না, ইসলাম বিদ্বেষীরা দিনরাত প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে যে, ইসলাম একটি জঘন্য সন্ত্রাসবাদী বিশ্বাস। তারাও কোর'আন থেকে, রসুলের যুদ্ধময় জীবন থেকে এই ঘটনা, ওই ঘটনা, এই হাদিস, ওই হাদিস তুলে এনে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অনুমোদন ইসলামে আছে, একজন প্রকৃত মুসলমান মানেই হচ্ছে একজন জঙ্গি। যারা জঙ্গি না তারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম না। মোহাম্মদ (সা.) জঙ্গিবাদই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এই কথা শুনে অনেকেই হয়তো নাউজুবিল্লাহ পাঠ করবেন কিন্তু সেটুকুই কি যথেষ্ট? আপনাকে কি ঐ সব ধর্মবিদ্বেষীদের যুক্তি খণ্ডন করতে হবে না? যদি না করেন তাহলে মনে রাখবেন, মানুষ কিন্তু সাময়িক হুজুগে মাতলেও দিনশেষে যুক্তিশীল প্রাণী। তারা ঐ ধর্মবিদ্বেষীদের যুক্তিকেই মেনে নেবে এবং ইসলামবিদ্বেষী হয়ে যাবে। এখন যদি কেউ জঙ্গিবাদী ও ধর্মবিদ্বেষী এই উভয় তাবুর উত্থাপিত যুক্তিগুলোকে খণ্ডাতে না পারেন তাহলে মুখে মুখে ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে জিকির করে কোনো ফায়দা হবে না, ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে জঙ্গি হওয়া থেকে ফেরাতে পারবে না, যুক্তিশীল ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে নাস্তিক ধর্মবিদ্বেষী হওয়া থেকে ফেরাতে পারবে না।

এখানেই দরকার ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরা এবং রসুলাল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা। এটি একটি কঠিন আদর্শিক লড়াই। প্রত্যেকটি কথাকে ইসলামের শিক্ষা দিয়েই খণ্ডাতে হবে, রসুলের জীবন থেকেই আপনাকে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকে তুলে আনতে হবে। এটা করতে আমাদের আলেম ওলামারা ব্যর্থ হচ্ছেন। তারা কেবল অমুক নাস্তিক, তমুক মুরতাদ ইত্যাদি বলে গলাই ফাটাতে পারেন আর পারেন দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে হামলা করতে। শক্তিমানের অর্থের কাছে তাদের আত্মা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেছে। ধর্মবিক্রী তাদের জীবিকা; তাদের নৈতিক শক্তি নিঃশেষিত; মানবজাতিকে, মুসলিম জাতিকে এই ঘোর সংকটকালে রক্ষা করতে তাদের কোনো উদ্যোগ নেই, বক্তব্য নেই। তাদের বক্তব্য কেবল বিভাজনই বৃদ্ধি করতে পারে, সংযুক্ত করতে পারে না। কিন্তু এখন বিভাজনের সময় নয়। সমগ্র মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীর জীবন আজ হুমকির মুখে পড়েছে। কখন কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ আক্রান্ত হয় তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মড়ার উপর খাড়ার ঘা হয়ে জাতির রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে চলেছে ফেরকা মাজহাবের দ্বন্দ্ব সংঘাত। এসব অন্তর্গত সংঘাত আমাদের পতনকেই তরান্বিত করছে। আমরা আশঙ্কিত, কারণ আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৯০% নামে হলেও মুসলমান। তাই আমাদের দেশটিও যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তানের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের রণাঙ্গনে পরিণত হতে পারে।

এখন দরকার সেই আদর্শ যা শতধাবিভক্ত মুসলিম জাতিকে এক নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করবে, এক লক্ষ্যে চালিত করবে। এটাই হচ্ছে তাদের শক্তি ও পরাক্রম ফিরে পাওয়ার পূর্বশর্ত। এখন আর খুঁটিনাটি মাসলা মাসায়েল আর আমলের দোষ ত্রুটি নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, জঙ্গিবাদের ইস্যুতে ইতোমধ্যেই বহু দেশ কারবালায় পরিণত হয়েছে। আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমিকে যদি আমরা রক্ষা করতে চাই তাহলে মুসলিমদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদেরকে ঈমান ও দেশপ্রেমের চেতনায় জাগ্রত হতে হবে। সকল বিভাজনের বিরুদ্ধে তাদেরকে হতে হবে বজ্রকঠিন। প্রকৃত ইসলামের সেই ইতিহাস যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব, আদর্শ, বক্তব্য তুলে ধরছে হেযবুত তওহীদ যার সামনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ধর্মের নামে প্রচলিত সকল অপব্যাখ্যা, সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধত্ব, কুসংস্কার, ধর্মব্যবসাসহ সকল নষ্ট মতবাদ।